সেপ্টেম্বর ২০২১ ▪ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৮

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন

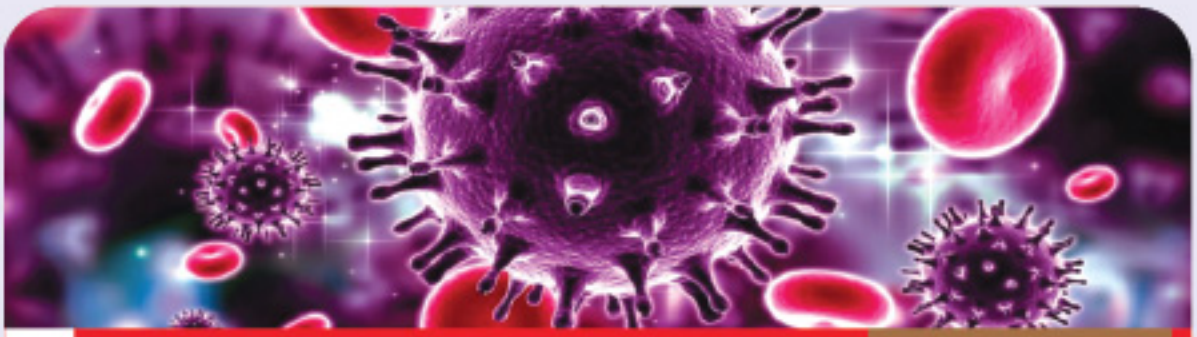

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

সেপ্টেম্বর ২০২১ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সম্পাদকীয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা চার মেয়াদে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং একটানা বারো বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এ বছর তাঁর ৭৫তম জন্মদিন। তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা রইল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেসময় শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় বেঁচে যান। ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসেন। তখন থেকে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি সংগ্রাম করেন। তিনি এ দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর এ দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করে। উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্তিকরণ, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং ঢাকায় মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু। শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বিশ্বের বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন ডিগ্রি ও পুরস্কার প্রদান করে। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। সরকার প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করেছে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সাক্ষরতার হার ৭৫ দশমিক ৬ শতাংশ। এ দিবস নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ।

২৮শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সর্বস্তরে দুর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে দিবসটি পালিত হয়। এ দিবস উপলক্ষে রয়েছে নিবন্ধ।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবার ২৬শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব নদী দিবস, ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস ও ৩০শে সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* সেপ্টেম্বর ২০২১ সংখ্যা। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা অধিকার সংগ্রামের প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা ৪
প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

শুভ শুভ শুভ দিন শেখ হাসিনার জন্মদিন ৬
প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

জীবনমানের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ৯
প্রফেসর ড. মো. গোলাম রহমান

বঙ্গবন্ধুর পুনর্জন্ম ১২
নির্মলেন্দু গুণ

জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য: সংগ্রামে জাগরণে পিতা ও দুহিতা ১৩
জাফর ওয়াজেদ

দেশরত্ন শেখ হাসিনা: অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ১৬
প্রফেসর ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

আলোকের ঝরনাধারা: বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শেখ হাসিনা ১৯
প্রফেসর ড. দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস

মুজিববর্ষে বিশ্বনেতাদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা ২৪
নাসরীন জাহান লিপি

প্রধানমন্ত্রীর কফি ২৯
ফরিদুর রেজা সাগর

শেখ হাসিনা: নদী রক্ষায় আন্তরিক প্রধানমন্ত্রী ৩১
প্রফেসর ড. তুহিন ওয়াদুদ

শেখ হাসিনার চার দশকের সংগ্রাম ৩৪
শামসুজ্জামান শামস

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা ৩৮
শামস সাইদ

কন্যাশিশুরাও উন্নয়নের অংশীদার ৪২
হাছিনা আক্তার

বাংলাদেশ পর্যটনে রোল মডেল ৪৪
কাদের বাবু

গল্প

পিতার স্বপ্ন ছুঁয়ে ছুঁয়ে ৪৭
কাজী কেয়া

কবিতাগুচ্ছ **৪৯-৫৩**

ফারুক নওয়াজ, শিরিন আক্তার, মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন, গোলাম নবী পান্না, মোহাম্মদ আলী খান, আবুল হোসেন আজাদ, শিল্পী ভদ্র দীপিকা, কামাল বারি, বদরুল হায়দার, মোহাম্মদ ইলইয়াছ, সাইদ তপু, গোবিন্দলাল সরকার, ইজামুল হক, বেগম শামসুন নাহার, নিরু আক্তার অনু, মো. কামাল শেখ, আতিক রহমান, মিজানুর রহমান মিথুন, আহসানুল হক, রবিউল ইসলাম

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৫৪
প্রধানমন্ত্রী	৫৪
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	৫৬
আন্তর্জাতিক	৫৬
উন্নয়ন	৫৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫৭
শিল্প-বাণিজ্য	৫৮
কর্মসংস্থান	৫৯
নারী	৫৯
সামাজিক নিরাপত্তা	৬০
পরিবেশ ও জলবায়ু	৬০
যোগাযোগ	৬১
সংস্কৃতি	৬১
চলচ্চিত্র	৬২
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৬৩
ক্রীড়া	৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেরার দেশে লেখক-গবেষক বশীর আল হেলাল **৬৪**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২১ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস-এর সঙ্গে বৈঠক করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন

গোপালগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণে পাটগাতী ইউনিয়নের ঘাঘর ও মধুমতী নদীবিধৌত এলাকার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা দম্পতির ঘরে ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। তিনি কৈশোর থেকেই রাজনীতি সচেতন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার মতো দেশকে ভালোবাসেন। প্রধানমন্ত্রী নয়, একজন মমতাময়ী মায়ের মতো তাঁর সকল কর্মকাণ্ড। তাঁর স্বপ্ন দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। বঙ্গবন্ধুকন্যা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বজন হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে সফলতার উচ্চতায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন নিরন্তর। তিনি ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলকে সুসংগঠিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে। শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সফল রাষ্ট্রনায়ক, সুলেখক, সংস্কৃতিমনা ও উন্নয়ন-অগ্রগতির আলোকবর্তিকা। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ উন্নয়নের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশ 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে কবিতা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও গান। তিনি দেশের অগ্রযাত্রায় অসংখ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, অর্জন করেছেন সম্মান ও মানুষের ভালোবাসা। তাঁর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা অধিকার সংগ্রামের প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা', 'শুভ শুভ শুভ দিন: শেখ হাসিনার জন্মদিন', 'জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য: সংগ্রামে জাগরণে পিতা ও দুহিতা', 'দেশরত্ন শেখ হাসিনা: অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব', 'আলোকের ঝরনাধারা: বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শেখ হাসিনা', 'মুজিববর্ষে বিশ্বনেতাদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা', 'শেখ হাসিনা: নদী রক্ষায় আন্তরিক প্রধানমন্ত্রী', 'শেখ হাসিনার চার দশকের সংগ্রাম', ও 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা নম্বর **৪, ৬, ১৩, ১৬, ১৯, ২৪, ৩১, ৩৪, ৩৮**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে মার্চ ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে দেশব্যাপী চলমান কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন– পিআইডি

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা অধিকার সংগ্রামের প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

২৮শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার জন্মদিন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে এরই মধ্যে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন তিনি। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে নিদারুণ এক দুঃসময়ে তিনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে পা রেখেছিলেন। হঠাৎ করেই তাঁর পদস্পর্শে পুরো বাঙালি জাতি ঝাঁকি দিয়ে জেগে উঠল। ভয়ে ম্রিয়মাণ স্বৈরশাসিত বাংলাদেশের হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা প্রতিস্থাপনের এক সাহসী এজেন্ডা নিয়ে তিনি এলেন। ঐ দুঃসময়ে বাঙালি জাতির নির্ভয় বিকাশের তিনিই প্রধান কাণ্ডারি। ভরসার প্রতীক। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে তিনি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেন। কবি নির্মলেন্দু গুণ যথার্থই লিখেছেন– 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সিঁড়িতে/ আপনি পা রেখেছেন মাত্র।/আপনার পথে পথে পাথর ছড়ানো/পাড়ি দিতে হবে দুর্গম গিরি, কান্তার মরুপথ।' (পথে পথে পাথর)। বিস্তর সেই চ্যালেঞ্জ বাবার মতোই দুঃসাহসের সাথে মুখোমুখি হয়েই এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। তাই অধ্যাপক ড. অনুপম সেন তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন 'অধিকার-সংগ্রামের বহ্নিশিখা' বলে (*গণতন্ত্রের বহ্নিশিখা শেখ হাসিনা*, বংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১৬, পৃ. ১৫৭)। ড. সেন ঐ প্রবন্ধেই লিখেছেন যে, 'যথার্থ অর্থেই, তিনি গণতন্ত্রের অগ্নিশিখা, মানুষের মুক্তির স্বাপ্নিক যোদ্ধা। ... একইসঙ্গে বজ্রের মতো কঠিন-কঠোর ও ফুলের মতো কোমল নেত্রী।' মানবসত্তাকে পূর্ণতা দিতে এবং দারিদ্র্য নিরসনে নিবেদিত এই 'মানবতা-ঋদ্ধ' নেত্রীর জন্য শুভ কামনায় তিনি প্রত্যাশা করেছেন যে, 'কোনো মেঘ আচ্ছাদিত না করলে, জ্যোতির্ময় আলো যে আসবে, এই দেশকে আলোয়-আলোয় ভরে দেবে, উদ্ভাসিত করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' (ঐ, পৃ. ১৮১)। সেই আলোর আভায় এখন দীপ্ত বাংলাদেশ। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁর হাত ধরে তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

গত দশ বছরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি তিন গুণ বেড়ে তিনশ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এই সময়েই জনগণের ভোগ বেড়েছে তিন গুণ। বিনিয়োগ বেড়েছে চার গুণ। মাথাপিছু আয় বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। দারিদ্র্য কমে হয়েছে অর্ধেক। মঙ্গা, ক্ষুধা, খাদ্যাভাব ও অনটন শব্দগুলো যেন উধাও। জীবনের গড় আয়ু বেড়েছে পাঁচ বছরেরও বেশি। দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হারও কমেছে আশাতীতভাবে। উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্ধেক। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দৌড়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব সেরা দেশগুলোর একটি। দক্ষিণ এশিয়ায় সেরা। আর তাই প্রয়াত মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁকে 'শান্তির দূত ও উন্নয়নের প্রতীক' বলেই থামেননি, আরও বলেছেন, 'শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছেন তাঁর নানামুখী দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের কারণে।' (ঐ, পৃ. ২১)। আরেক প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরী লিখেছেন, 'আমি গর্ব করে বলতে পারি বঙ্গবন্ধুকে আমি দেখেছি। তাঁর নিকট সাহচার্যে গেছি। এখন জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে আবারও গর্ব করে বলতে পারছি, আমি হাসিনার শাসনামলও দেখে গেলাম। আমার বিশ্বাস, হাসিনার শাসনামল একদিন অতীতের হোসেন শাহী শাসনামলের মতো বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে সংযুক্ত হবে।' (ঐ, পৃ. ৩৩)। প্রবীণ রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'একথা তর্কাতীত যে, সাহস-দুঃসাহসের ভেদরেখা ভেঙে একরোখা ইচ্ছাশক্তি নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বদেশ সাধনায় নিয়োজিত রয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ... বঙ্গবন্ধু যেমন একাধারে ইতিহাসের সৃষ্টি ও স্রষ্টা – বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা পিতৃদত্ত গুণে গুণান্বিত শেখ হাসিনাও ইতিহাসে নন্দিত ও বন্দিত হবেন।' (ঐ, পৃ. ৪৯)। আমাদের ঐতিহাসিক পথযাত্রায় শেখ হাসিনার নেতৃত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিচক্ষণতার সাথে তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক আবুল মোমেন। তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধু এবং শুভ বাংলাদেশ– সকল অশুভতার ভেতরেও যে প্রকৃত বাংলাদেশ জেগে আছে– তাঁর সাফল্যের জন্যে শুভকামনা নিয়ে সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অপেক্ষায় তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।' (ঐ, পৃ. ২১৩)।

শুধু বাংলাদেশের গুণীজন নন, পাশের দেশ ভারতের পশ্চিম বাংলার শিল্পী সাহিত্যিকদের লেখাতেও শেখ হাসিনার সারল্য, বাঙালিয়ানা, সাহিত্য প্রেম, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শী নেতৃত্বের নানা দিক ফুটে উঠেছে। সম্প্রতি 'জার্নিম্যান' প্রকাশিত ড. মো. মোফাকখারুল ইকবালের সম্পাদনায় *আপনজন শেখ হাসিনা* নামের একটি বইতে শেখ হাসিনার ওপর পশ্চিম বাংলার লেখকদের অনুভূতি স্থান পেয়েছে। 'আপনজন' শিরোনামে সমরেশ মজুমদার লিখেছেন, 'কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যখন মা অথবা দিদিবোন ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না তখন সেই দেশ নিজের দেশ হয়ে যায়।' (ঐ, পৃ. ১৪)। এই

লেখাতেই সমরেশ মজুমদার শেখ হাসিনার সহজ একটি প্রশ্ন তুলে ধরে তাঁর উত্তরও দিয়েছেন। তাঁর প্রতি শেখ হাসিনার প্রশ্ন: 'মাঝে মাঝে শুনতে পাই আপনি ঢাকায় এসেছেন। অথচ আমার সঙ্গে দেখা করেন না। কী ব্যাপার?' তাঁর উত্তরে তিনি হাসিমুখে বলেছিলেন, 'আপনি এতদিনে একটুও বদলে যাননি'। আর সে কারণেই তিনি তাঁর আপনজন। এই চিরায়ত বাঙালি সহজসরল শেখ হাসিনাকে 'তিমির-বিনাশিনী' উল্লেখ করে চন্দ্রন সেন লিখেছেন, 'মানুষের মুক্ত মানবিকতার অভিযানে শেখ হাসিনা তাঁর কালজয়ী শহিদ পিতার দুর্দম প্রতিশ্রুতি ভোলেননি।' (ঐ, পৃ. ১০)। প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত 'শেখ হাসিনাকে যেমন দেখেছি' নিবন্ধে লিখেছেন, 'হাসিনা বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে যে কতটা আগ্রহী তা তাঁর সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায়। এপার বাংলা থেকে কোনো বাংলা ভালো লেখা প্রকাশ হলে তিনি তা পড়ে ফেলেন।' (ঐ, পৃ. ৩৪)। 'বিশ্বের বিস্ময় আমার বিমুগ্ধ চেতনা' নিবন্ধে তুষার কান্তি বিশ্বাস লিখেছেন, 'যে মানুষটির উপর উনিশবার সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে, সেই মানুষটা এমন নিশ্চিন্তে থাকেন কীভাবে। স্পষ্ট হলো তাঁর কথাতেই। সাধারণ মানুষ যাঁর সঙ্গে থাকেন, তাঁর কোনো ভয় থাকে না, থাকতে পারে না। ... কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু আমার বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি তখন যেন আমার পরিবারেরই একজন অভিভাবক। আমার পিসিমা বা মাসিমা বসে রয়েছেন আমার সামনে। এ মুগ্ধতা কবে কাটবে জানি না।' (পৃ. ৩৮-৩৯)।

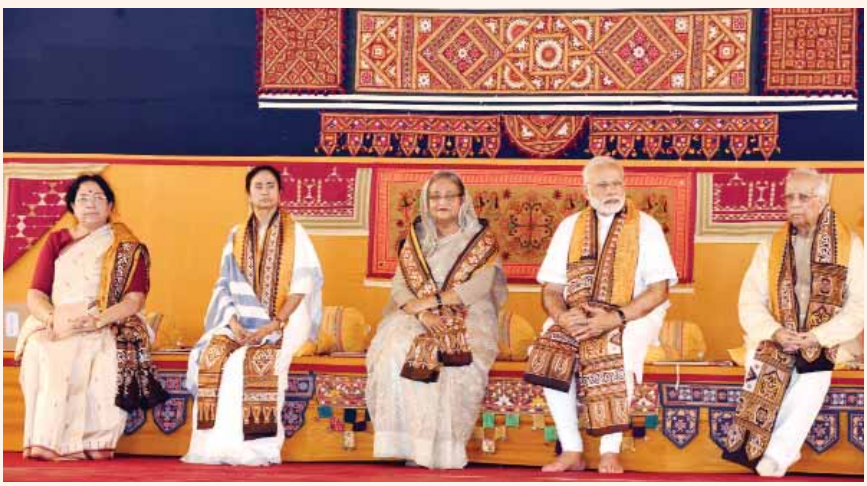

ভারত সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মে ২০১৮ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন– পিআইডি

শেখ হাসিনার আরেক অনুরাগী রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বাংলা ব্যাকরণ চর্চার অন্যতম দিকপাল পবিত্র সরকার। তিনি বিশ্বভারতী সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে দেওয়া শেখ হাসিনার অভিভাষণে মুগ্ধ। তাই লিখেছেন, "শেখ হাসিনার বাংলা অভিভাষণ বাঙালি শ্রোতাদের কানে 'মধুবর্ষণ' করেছিল। অনেকেই বলাবলি করেছেন যে, এমন সহজ, স্বাচ্ছন্দ্য বাংলা বাংলাদেশের বাইরে শোনার সুযোগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আমিও একাধিকবার তাঁর অনাড়ম্বর কিন্তু আন্তরিক বাংলা ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছি।" (ঐ, পৃ. ৪৪-৪৫)। বাংলাদেশেই জন্মেছেন তিনি। এখন থাকেন পশ্চিম বাংলায়। কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়নে সদাই উদ্দীপ্ত। বাংলা ভাষার উন্নয়নে সদা তৎপর। তাই পবিত্র সরকার লিখতে পারেন, 'আমি জানি শেখ হাসিনার আমলে বাংলার মানুষ গর্ব করার অনেক কিছু পেয়েছেন, বাংলার সদা জাগ্রত বুদ্ধিজীবীরা মত-প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূমিতল পর্যন্ত পৌঁছেছে।' (ঐ, পৃ. ৪৯)। ঐ বইতেই 'বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ উন্নতির লক্ষ্যে দশ কদম এগিয়েছেন' বলে দাবি করেছেন প্রতিমরঞ্জন বোস। অমলেশ দাশ গুপ্ত লিখেছেন, 'এক কথায় সামাজিক প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার যেভাবে এগিয়ে এসেছে তা অকল্পনীয়।' (ঐ, পৃ. ৭৩)।

প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেও সহজ ও স্বাভাবিক শেখ হাসিনা কী করে নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে এতটা কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে বিষয় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অন্যান্য প্রায় সবাই। ইনিই শেখ হাসিনা। তিনি দারুণ বিনয়ী, খুবই পরিশ্রমী, সর্বক্ষণ সতর্ক, দুঃখী মানুষের দুঃখে কাতর, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা অর্জনের স্বপ্নে বিভোর এবং উদার চিন্তায় নিবেদিত এক দূরদর্শী নেত্রী। তাই বরাবরই শেষ হাসিটা তিনিই হাসতে পারেন। বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কৌশিক বসুকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে। সেসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তিনি দীর্ঘ আলাপ করেছিলেন। সেই স্মৃতি তাঁর এখনো মনে আছে। তাই তিনি 'প্রজেক্ট সিন্ডিকেট'-এ শীর্ষক ১লা মে ২০১৮ তারিখের এক লেখায় লিখেছেন যে, ধর্মীয় উগ্রবাদিতার ঝুঁকি মোকাবিলায় শেখ হাসিনা অসাধারণ উদার নৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বলেই বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা টেকসই হবে। তিনি আরও লিখেছেন, যখন কোনো দেশ দ্রুত উন্নতির পথে হাঁটে তখন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বৈষম্য, সন্ত্রাস, ধর্মীয় উগ্রবাদিতার মতো ঝুঁকি দেখা দিতেই পারে। কিন্তু শেখ হাসিনার মতো উদার ও শক্তিশালী নেতৃত্বের গুণেই এশিয়ায় উন্নয়নের সাফল্যের গল্পটি দানা বাঁধবে বাংলাদেশকে ঘিরেই।

বিশ্বজুড়েই আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য টেকসই উন্নয়নের উজ্জ্বল এক প্রতীক। হতে পেরেছেন সবুজ ধরিত্রীর অনন্য রক্ষক। তিনি মানবতার মা। শান্তির দূত। নারীর ক্ষমতায়নের উৎস। দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। অধিকার-সংগ্রামের বহ্নিশিখা এবং কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষের ভরসার আরেক নাম। তাঁর সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্বেই দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বৈষম্য, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, ধর্মীয় উগ্রবাদিতার মতো দারুণ সব ঝুঁকি মোকাবিলা করে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে হাঁটছে প্রিয় বাংলাদেশ। সামাজিক অনাচার ও অন্যায়ে লিপ্ত, ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞানকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে তিনি আজ যুদ্ধে লিপ্ত। তাঁর এই সাহস ও জনস্বার্থপ্রীতির কারণে দেশবাসী সুশাসনের ব্যাপারে আশান্বিত। সাধারণ মানুষসহ সকল শুভ প্রাণ মানুষের শুভেচ্ছায় আজ তিনি সিক্ত। বঙ্গবন্ধুকন্যার জন্মদিন উপলক্ষে লেখাটি শেষ করছি কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজীর 'ভেতরের চোখ' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করে–

তাঁর চোখে কথা বলে চলে
যেন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল।

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

শুভ শুভ শুভ দিন শেখ হাসিনার জন্মদিন

প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

কোনো কোনো মানুষের জন্মদিন এলেই আমার কিছু বিজ্ঞানীর কথা বেশি করে মনে পড়ে। এসব বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে তারা ইচ্ছে করলেই এমন সব ওষুধ বা খাদ্যসামগ্রী বের করতে পারেন– যা দিয়ে মানুষের বর্তমান আয়ু দ্বিগুণ করা সম্ভব। আমি ভাবি কেন তারা এমনটি করেন না। পৃথিবীতে অপরিহার্য কিছু মানুষের আয়ু দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলে সামগ্রিকভাবে মানুষ উপকৃত হতে পারত। বাংলাদেশের দিকে তাকালে এ প্রশ্নে যার কথা প্রথম মনে পড়ে, তিনি হলেন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠকন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসাবে তাঁর বয়স ৭৪ বছর পূর্ণ হলো। এই সময়টা তাঁর কেটেছে পড়াশুনায়, রাজনৈতিক প্রস্তুতিতে, কিছুটা সময় বিচ্ছেদবেদনা ও একাকিত্বে, আর বাকিটা সময় কেটেছে জনমঙ্গলে অর্থাৎ রাজনীতিতে। রাজনীতিতে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকাটি তাঁকে শুধু দেশে নয়, বিদেশেও একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনীতি তাঁকে সফল শাসক ও অনন্য রাষ্ট্রনায়কের আসনে বসিয়েছে।

শেখ হাসিনার পড়াশোনার সূচনা ঘটেছে টুঙ্গিপাড়ার কেরালকোপা পাঠশালায়, আর সমাপ্তি ঘটেছে সেরা বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যদিও বহুবিধ কারণে তিনি তাঁর এমএ ডিগ্রি সমাপ্ত করতে পারেননি। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে সেই শেখ হাসিনাই বিশ্বের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বহু নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ডজন খানেক সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। নিজের বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও বাদ পড়েনি।

শেখ হাসিনার রাজনীতির হাতেখড়ি ঘটে সেই ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে। সেই হিসেবে তাঁর রাজনীতির অভিজ্ঞতা ৪৯ বছরের। তাঁর রাজনীতির প্রায়োগিক সময়টি হচ্ছে ১৯৬৬ সালে ঢাকার তৎকালীন গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ (বর্তমান বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ)-এর সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে। তাঁর বিজয় শুধু ছয় দফা আন্দোলনে প্রচণ্ডতা দেয়নি, প্রায়োগিক রাজনীতির অঙ্গনে পদচারণাও দৃশ্যমান করে। ১৯৬৭ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনার্সে ভর্তি হয়ে তিনি ছাত্রলীগের মহিলা শাখার রাজনীতিকে সঞ্জীবিত করেন এবং ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক শাখা শিল্প ও সাহিত্য সংঘের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ছদ্মাবরণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চলমান রাখেন। ১৯৬৭ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও ১৯৬৯ সালের ১১ দফা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় নীত বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও গণ-অভ্যুত্থানে তিনি ছিলেন রাজপথের অক্লান্ত সৈনিক। স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে বিদেশ গমনের কারণে তাঁর রাজনীতিতে কিছুটা ভাটা পরিলক্ষিত হলেও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মা ফজিলাতুন নেছা ও নিজে মিলে সংগোপনে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নিজের ছেলের ডাক নাম 'জয়' সংযুক্তি ও এর প্রকাশ্য ব্যাখ্যা তাঁর দুঃসাহসিক মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটায়। তারপর বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা ও পরিবারের তিনভাই ও অন্যান্যদের অপঘাতে ও অকাল মৃত্যুর পরও তাঁর বিদেশে দুঃসাহসিক সক্রিয়তা অবলোকন যোগ্য।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাত্রির অমানিশা মাথায় নিয়ে ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব নেন শেখ হাসিনা। আজও তিনি শুধু আওয়ামী লীগ নয়, দেশের অবিসংবাদিত জননেত্রী, কারো চোখে দেশরত্ন, কারো কাছে গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মানবতার জননী, উন্নয়নের রোল মডেল, সবার কাছে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার সুযোগ্য সন্তান। তিনি যে অনন্য, সভাপতি হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শাসক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আবির্ভাবের পূর্বে একজন দক্ষ বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে জীবন সংহারের ঝুঁকি নিয়েও তিনি বেঁচে বর্তে আছেন। নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ভগ্নপ্রায়, ম্রিয়মাণ ও কোন্দলে জর্জরিত দলকে সুসংগঠিত ভিত্তির ওপর প্রতিস্থাপন। এই দলের বদৌলতে তিনি ক্ষমতায় আরোহণের পথ সুগম করেছিলেন।

১৯৮৬ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে বিরোধী নেত্রীর আসনে তিনি বসলেন। জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এরশাদীয় অপশাসন রোধে তিনি ১৯৮৮ সালে পদত্যাগও করেন। তারপর ১৫ দলীয় জোটের প্রধান হিসেবে এরশাদ পতন নিশ্চিত করেন। ১৯৯১ সালে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিশ্চিত করে শতাংশের হারে বেশি ভোট পেয়েও সূক্ষ্ম কারচুপির কারণে তিনি বিরোধী দলে থাকতেই বাধ্য হলেন। আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রইল, আর তাঁর ও পরিবারের জীবন ঝুঁকি ক্রমাগত বাড়তেই লাগল। ঘাতক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে এই ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে দিলেন। ১৯৯৬-এর ১২ই জুনের নির্বাচনে শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিষ্ঠানের পর তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার ও সেনাশাসিত সরকার উচ্ছেদের দুঃসাহসিক আন্দোলনে জীবন সংহারের নিশ্চিত লগ্ন এলেও তিনি জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কোনো কিছু করেননি। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর পর আর কেউ এমন লক্ষ্যাভিমুখী ও আপোশহীন আন্দোলন সংগ্রামে ব্রতী ছিলেন না। বস্তুত তিনি নিজকে জাতির ত্রাতা হিসেবে প্রমাণ করার পন্থাবলম্বন করলেন।

সরকার পরিচালনার ক্ষমতায় প্রথমবার অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি যা অর্জন করলেন তার ফিরিস্তি দীর্ঘ, কিন্তু কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ বিশাল হিমবাহের শীর্ষ দেশটা প্রদর্শনে সমর্থ হবে বলে মনে করি। ক্ষমতায় বসেই তিনি গণতন্ত্র এবং জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পাশাপাশি কতিপয় বহু বিলম্বিত ও জাতিসত্ত্বার অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি নজর দিলেন।

এসবের মধ্যে রয়েছে ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তি ও পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার রোধে প্রণীত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বিল রদসহ বিচার প্রক্রিয়ার সূচনা। দুর্গতিময় অর্থনীতির মাঝেও তিনি দুস্থ ও নিরন্নের খাদ্য, বস্ত্র, আবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভূতপূর্ব কর্মসূচি হাতে নিলেন। হতদরিদ্র একটি দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্‌বোধন একটি অকল্পনীয় ব্যাপারই ছিল।

প্রথম শাসনামলে তাঁরই কর্মকৌশলতার কারণে বাঙালির অহংকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইউনেসকো ঘোষণা করল। তাঁর শাসনামলেই ১১তম দীর্ঘ সেতু, যমুনা সেতুর সমাপ্তিকরণ শুধু নয়, বিশ্বময় আর্থিক সংকটের মধ্যেও ঠিকমতো ব্যবস্থাপনার কারণে দেশটি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক উদীয়মান ব্যাঘ্রদের উতরে যেতে পেরেছিল।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। এ জাতির ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল যা– ম্যালথাসের জনমিতি তত্ত্বকে হার মানিয়েছে। পরবর্তীতে তারই ধারাবাহিকতায় উত্তর বঙ্গ থেকে মঙ্গা বিদূরিত হয়েছে। তাঁর শাসনামলে বন্যা, খরা, দুর্যোগ, সিডর হানা দিয়েছে। সবাইকে চমকে দিয়ে নিপুণ ব্যবস্থাপনার কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তিনি অনুকরণীয় হয়েছেন।

প্রথম শাসনামলে তিনি নিজের নামের সঙ্গে বাবা ও মার নাম সংযোজন বাধ্যতামূলক করেছেন এবং দেশের সোনার সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের নিবন্ধকরণ ও পুনর্বাসনের যথার্থ উদ্যোগ নিয়েছেন। এমনি আরও বহু উদ্যোগের পরও ২০০১ সালে তাঁর শাসনের সফল সমাপ্তির পর কুচক্রীদের কূটচালে তাঁর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় না।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া মাঝপথে থেমে গেল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ হিমাগারে চলে গেল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কমিউনিটি হাসপাতাল উদ্যোগ ব্যাহত হলো। দেশটিই কেবল সংকটে নিপতিত হলো না, তাঁর ব্যক্তিজীবন গভীর সংকটে নিপতিত হলো। ২০০৪ সালের গ্রেনেড হামলার কথা স্মরণে এলে গা শিউরে ওঠে। মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ যে তাঁকে রক্ষা করেনি, সেদিন তা প্রমাণিত হলো। তারপরও নির্ভীক শেখ হাসিনা দৃঢ়তা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে ফেরত আনার জন্যে দিন বদলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০৯ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন।

লেখক প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কাজ সমাপ্ত করে কুখ্যাত শীর্ষ অপরাধীদের শাস্তির বিধান করলেন। চারনেতা হত্যাকারীদের শাস্তির বিধান করলেন। তারপর শুরু করলেন ঘাতক–দালাল-যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচার। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার কয়েকদিনের মাথায় মানব সৃষ্ট দুর্যোগ তথা বিডিআর বিদ্রোহ তাঁর শাসনকে আলোড়িত করেছে। তিনি যে দক্ষতা, দৃঢ়তা ও দ্রুততার সঙ্গে সে বিদ্রোহ দমন করে দেশের দুটি বৃহৎ বাহিনীর আসন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘাত প্রশমন করেছেন ও দোষীদের শাস্তি বিধান করেছেন, তার জন্য প্রশংসা সর্বত্র পেয়েছেন। কৌশলগত ব্যবস্থাপনার একজন প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে তাঁর আমি অতি উচ্চ মূল্যায়ন করেছি। দু-দুবার হেফাজতে ইসলামের জাতিবিধ্বংসী উত্থানের ত্বরিত সমাধান তাঁকে অনন্য ক্রাইসিস ম্যানেজারের পদে বসিয়েছে।

বিরূপ পারিপার্শ্বিকতার মাঝেও তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারি স্মরণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেছেন। বাঙালির মনন বাংলা একাডেমির কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়াও আইনি প্রক্রিয়ায় এর আধুনিকায়ন করে ঈর্ষান্বিত পদক্ষেপ নিয়েছেন। এসব যুগ যুগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এসময় থেকে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে ছয় ভাগ থেকে প্রথমে ৭.২ ভাগ এবং তারপর আট ভাগে বাস্তবায়ন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনা হয়েছে, মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, সুপেয় পানির সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যে ভেজাল নিরোধ, চিকিৎসা সেবা, জন্মনিয়ন্ত্রণ সূচকে প্রতিবেশী সবকটি দেশকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে।

গণপ্রশাসনকে গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, নতুন পদ সৃষ্টি ও পদবিন্যাস করা হয়েছে। শ্রমিকসহ অন্যান্যরাও সমানুপাতিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অর্জন তাঁকে এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক প্রশংসা। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তির হার প্রায় শত ভাগে পৌঁছেছে। প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার পাঠ্যপুস্তক ছাপিয়ে তা বিনামূল্যে অবারিত বিতরণ তাঁর আমলের আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা। বিস্ময়কর হচ্ছে করোনার ছোবলেও তা স্তিমিত হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে মেডিক্যাল কলেজ ছিল মাত্র তিনটি, বর্তমানে সে সংখ্যা শতের কাছাকাছি পৌঁছেছে। চারটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০টিতে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৭টি। প্রতিটি জেলায় একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রাও অচিরে অর্জিত হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে যথোপযুক্ত গুরুত্বসহ এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে রেখে জনমিতির সুযোগ নেওয়ার জন্যে টেকনিক্যাল শিক্ষার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানা যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া পরিবর্তনের নজির কদাচিত আছে। শেখ হাসিনার শাসনামলে সমুদ্র বিজয় ও ছিটমহল প্রাপ্তির কারণে ভৌগোলিক সীমানা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। নীল অর্থনীতির সূচনা হয়েছে সমুদ্র জয়ের পর থেকে। মধ্যম আয়ের দেশের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অর্জিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জন ২০২১ সালে নির্ধারিত হলেও ২০১৩ সালের মধ্যে সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে তিনি ও তাঁর সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় সমালোচক ও উপহাসকারীদের সদুত্তর দিয়েছেন।

১৯৭২ সালের সংবিধানে ১৯৭৫-পরবর্তী অনাকাঙ্ক্ষিত অস্ত্রোপচারগুলো সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে ফেরার পথ

সুগম করা হয়েছে। মৌলবাদী, ধর্মান্ধ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে– তা এক অনন্য রেকর্ড।

করোনার মাঝেও আমাদের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২৩০০ ডলারের কাছাকাছি– যা ২০০৫-২০০৬ সালে ছিল ৫৪৩ ডলার; পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, ১০টি মেগাপ্রকল্পে অর্জন মাত্রাকাঙ্ক্ষিত পর্যায় ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তির সুফল প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় চোখ ধাঁধানো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অকল্পনীয় সম্প্রসারণ ঘটেছে। মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে ২০০৫-২০০৬ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ, বর্তমানে তা ২০.৫ শতাংশ। জিডিপি'র আকার ছিল ৪ লাখ ৮২ হাজার কোটি, বর্তমানে ২৮ লাখ কোটি টাকা। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ০.৭৪৪ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানে তা প্রায় ৫৬ বিলিয়ন ডলার। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা, বর্তমান আকার ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। ১৯৭১-১৯৭২ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩৭ বছর, বর্তমানে গড় আয়ু ৭৩ বছরের বেশি। শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ছিল ৮৪ জন, মাতৃমৃত্যুর হার লাখে ছিল ৩৭০ জন, করোনার অনাকাঙ্ক্ষিত আগমনের পূর্বে তা ছিল যথাক্রমে ২৮ ও ১৬৫ জন।

২০০৫-২০০৬ সালে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৭৩ কোটি টাকা, বর্তমানে তা ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা। ২০০৫-২০০৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ৪৯০০ মেগাওয়াট, বর্তমানে সক্ষমতা ২৪৪২১ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের সুবিধাভোগী ছিল ৪৭ শতাংশ, বর্তমানে বিদ্যুতের সুবিধাভোগী ৯৯ শতাংশ।

২০০৫-২০০৬ সালে দেশটি ছিল স্বল্পোন্নত আর আজ তার উত্তরণ ঘটেছে মধ্যম আয়ের দেশে। ২০০৫-২০০৬ সালে পাকা সড়ক ছিল ৩৬১০ কিলোমিটার, বর্তমানে ২১ হাজার ৫৯৬ কিলোমিটার। ২০০৫-২০০৬ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬.৮%, বর্তমানে ৭৪.৭ শতাংশ। ফাইভ জি ইন্টারনেট, সারা দেশে মুঠোফোন, ইন্টারনেট এমনকি ৩১টি দ্বীপে ইন্টারনেট সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭১ সালে ১০ হাজার ৪৯০ জনে একজন রেজিস্ট্রার্ড ডাক্তার ছিলেন, বর্তমানে ২ হাজার ৫৮১ জনে একজন রেজিস্ট্রার্ড ডাক্তার আছে। ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। করোনা মোকাবিলার উপযোগী করে স্বাস্থ্য খাতকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা তাঁর চতুর্থ মেয়াদ পর্যন্ত যেসব বিজয় অর্জন করায়ত্ত করেছেন তার ফিরিস্তিই বলে দিচ্ছে তাঁকে প্রদত্ত দেশরত্ন খেতাব কতটা যৌক্তিক, কতটা প্রাসঙ্গিক তাঁর অন্যান্য পুরস্কার ও অভিধা। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে তিনি 'মাদার অব হিউম্যানিটি' উপাধি পেয়েছেন। ইন্টারপ্রেস নিউজ এজেন্সির প্রদত্ত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন কর্তৃক প্রদত্ত স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড শুধু রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবিক আচরণের ফলশ্রুতি। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মিলিয়ে তাঁর পুরস্কার বা স্বীকৃতির সংখ্যা ৪০টি ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে নেতৃত্বের সফলতা, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, তথ্যপ্রযুক্তিতে অভাবনীয় সাফল্য, ক্ষুধা-দারিদ্র্য প্রশমন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন, সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্যত শেখ হাসিনা হচ্ছেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতার বিপক্ষে এবং শান্তির স্বপক্ষে নিরন্তর যোদ্ধা। দেশের মাটিতে তাঁর বড়ো স্বীকৃতি হচ্ছে একনাগাড়ে বারো বছরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান ও প্রায় সতেরো বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে রাষ্ট্রনায়কোচিত আচরণ। আন্তর্জাতিক বিশ্বে সভা-সমিতি-সেমিনার ও গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বিশ্বের বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে তাঁর অংশগ্রহণ আমাদের গর্বিত করে।

করোনা সংকটকালে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজন আনুপাতিক গুরুত্ব দিয়ে লড়ছেন শেখ হাসিনা। দুর্গতিময় সারা বিশ্বে উন্নয়ন হার কমলেও আমাদের কিন্তু এখনো তেমন কমেনি। দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সরকার ও দল মিলে ক্ষুধা, দারিদ্র্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও সুশিক্ষার জন্যে লড়ে যাচ্ছেন অবিরত।

অতি সম্প্রতি তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে দুটো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ উদ্‌বোধন করেছেন, ১০০টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জোনের অর্ধেকের বেশি বাস্তবায়ন হয়েছে। দুঃসময়ে রপ্তানি থমকে নেই, বিশ্বের নতুন নতুন বিনিয়োগের গন্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশ। এই সংকটের মুখেও সোয়া লাখ গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মধ্যে আবাসন সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সুলেখক। তিনি সাময়িক ও সংবাদপত্রেও রীতিমতো লিখে থাকেন। এসব লেখনীতে বেদনাদায়ক স্মৃতিকথা ছাড়াও আছে তাঁর জীবনদর্শন, স্বপ্ন, স্বপ্ন বাস্তবায়নের কৌশলী পদক্ষেপের কথা। তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা একাডেমি তাঁকে সম্মানীয় ফেলোশিপ দিয়েছে। বাংলার ছাত্রী হিসেবে এসব আমাদের কাম্য কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা বিস্ময়কর, বিস্ময়কর বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশের আগাম স্বীকৃতি, উচ্চ আয়ের রূপকল্প। আরও প্রশংসনীয় শতবর্ষের রূপকল্প ও স্বপ্ন, যার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বদ্বীপ পরিকল্পনায়। সব কিছু বিশ্লেষণে দেখা যাবে তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী একজন বিরল নেত্রী, তাই তো দেশরত্ন।

শেখ হাসিনা বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী নারী সরকারপ্রধান এবং একই সঙ্গে বিশ্বের সৎ নেতৃত্বের তালিকায় তাঁর অবস্থান তৃতীয় (২০১৭ সাল)। পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্সের গবেষণায় দেখা গেছে, শেখ হাসিনার বাংলাদেশের বাইরে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। সংস্থাটি দেখেছে, বেতন ছাড়া শেখ হাসিনার সম্পদের স্থিতিতে কোনো সংযুক্তি নেই। শেখ হাসিনার কোনো গোপন সম্পদ নেই বলে নিশ্চিত হয়েছে পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স।

একবার তাঁকে একটা বই উৎসর্গ করেছিলাম। লিখেছিলাম, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উৎসর্গ' যিনি ক্রমান্বয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে চলেছেন। ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও কুসংস্কার মুক্তির লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন– যা আমাদের গৌরব, গর্বের ও অনুকরণীয়।

বাংলাদেশ শ্রীলংকাকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহীতা থেকে দাতায় রূপান্তরের পথ ধরেছে। কোটি মানুষ তাঁর শুভ কামনা করছে, তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছে। তাদের প্রার্থনাই হয়ত শেখ হাসিনার আয়ু বাড়িয়ে দিচ্ছে। কোটি কোটি মানুষের কামনা দৃশ্যমান না হোক, তাদের তৃপ্ত দেহমন হয়ত অজান্তেও তাঁর জন্যে প্রার্থনা করছে। তাদের সঙ্গে শুধু কণ্ঠ নয়, অন্য ইন্দ্রিয়গুলো মিলিয়ে আমিও তাঁর শুভকামনা করছি। স্রষ্টা যেন আমার 'প্রার্থনা' কবুল করে নেন এবং আমাদের প্রিয় দেশরত্নকে নিঃরোগ শতায়ু দান করেন।

প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর উপাচার্য

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সভাকক্ষে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন – পিআইডি

জীবনমানের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ

প্রফেসর ড. মো. গোলাম রহমান

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন থেকে এটিকে কার্যকর করার ব্যাপ্তি আমাদের দেশে প্রায় একযুগ। একযুগ পূর্তি হচ্ছে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠারও। আমরা জানি, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক্স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পায়, দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং সুশাসন স্থায়ী হয়।

একটা সময় ছিল যখন তথ্যের ব্যবহার ছিল সীমিত, মানুষের আচার-আচরণ এবং জীবনযাপনও ছিল ছকে বাঁধা। জনপরিসর ছিল বৃত্তাবস্থায় আবদ্ধ। গণমাধ্যমের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনপরিসরের স্থান দখল করে নেয় বৈচিত্র্যময় গণমাধ্যম। সেখানেও প্রযুক্তির সংশ্লিষ্টতা অনস্বীকার্য। প্রযুক্তি বিশেষ করে স্যাটেলাইট নির্ভর যোগাযোগ অনন্য হয়ে উঠে। টেলি-কমিউনিকেশন এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির উন্নয়ন অতি দ্রুত বিশ্বায়নের তাবৎ চরিত্র দেয় পালটে, ইন্টারনেট দ্রুত এবং একইসঙ্গে অসংখ্য ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার যে সুযোগ করে দিয়েছে– ইতঃপূর্বে এই ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। কোনো মাধ্যম কিংবা গণমাধ্যম একইসঙ্গে বহুমুখী (Multi-directional) যোগাযোগ করতে পারেনি। বর্তমানে একজন ব্যক্তি বিশ্বের যে-কোনো স্থানে যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষমতা অর্জন করেছে। শুধু ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি নয়, এক ব্যক্তি অনেক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম। সেখানে শুধু সেই ব্যক্তির মত-প্রকাশই নয়, অনেক ব্যক্তির মতামত গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। স্বীয় মতামত এবং জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত এবং স্বল্প সময়ে যোগাযোগ স্থাপন, মতামত আদান-প্রদান এবং দুর্লভ তথ্য ও যোগাযোগ উপকরণ প্রাপ্তির যে সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা অকল্পনীয় এক তথ্য ভাণ্ডার।

ইন্টারনেট তথা প্রযুক্তির এই বিশ্ব তথ্য ব্যবস্থায় ব্যক্তি হিসেবে একজন নাগরিককে শুধু আত্মসন্তুষ্টির জন্য তথ্য ব্যবহারের মধ্যে সীমিত রাখলেই চলবে না। বিশ্ব তথ্য ব্যবস্থায় ব্যক্তির তথ্য ব্যবহার যেন স্থানীয় এবং বিশ্ব তথ্য ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে সে কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

বিশ্বের তথ্য প্রবাহর অসমতা ও ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা গেছে গত ৭০-এর দশক থেকে। তাই নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ১৯তম সাধারণ অধিবেশনে (অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৭৬) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, "....it was generally agreed that " the highest priority should be given to measure aiming at reducing the communication gap existing between the developed and the developing countries and at achieving a freer and more balanced international flow of information" and that "a review should be undertaken of the totality of the problems of communication in modern society" (Many Voices, One World (Report by the International Commission for the Study of Communication Problems), Unesco, New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co., 1982, p. 295) অতঃপর ডিসেম্বর ১৯৭৭ সালে (Sean MacBride Nobel Peace Prize awarded in 1974)-এর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রযুক্তির উদ্ভাবনের কারণেই শুধু উন্নয়ন ঘটে না, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সচেতনতা ও প্রয়োজনীতার কারণে তা ঘটে থাকে। সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠী, যারা যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনগণ, যাদের ওপর যোগাযোগের প্রভাব পড়ে– এই দুই ধরনের লোকের মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলছে। যে কারণে রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব এবং জনগণের ব্যক্তিজগতে, সরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যমের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। এই প্রেক্ষাপটে শুধু আন্তর্জাতিক তথ্য প্রবাহই বিঘ্নিত হচ্ছে না বরং অঞ্চল থেকে অঞ্চলে, প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণের তথ্য প্রবাহ এবং জনগণের মধ্যে তথ্য অভিগম্যতা অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। আশির দশক থেকে নতুন বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (New World Information and Communication Order) নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিশ্ব তথ্য ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তারপর কেটেছে অনেকটা সময়।

বাংলাদেশসহ বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনগণকে ক্ষমতায়িত করার কোনো প্রচেষ্টাই প্রকৃত অর্থে নেওয়া হয়নি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রও জনগণের পারস্পরিক অবস্থান দুই মেরুতে অবস্থান করছে।

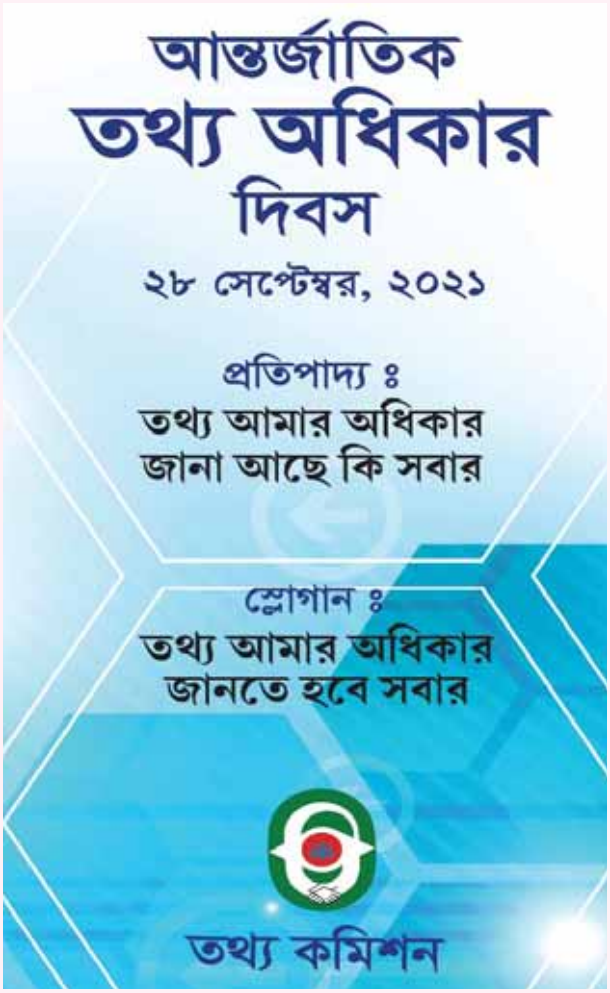

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মহান ঐতিহ্যে লালিত একটি ক্রমউন্নয়নশীল দেশ। দেশের জনগণ প্রকৃত অর্থে প্রগতিশীল, সমাজ-সচেতন ও শান্তিপ্রিয়। ঐতিহ্যগতভাবে দেশে যে আইনকানুন প্রচলিত আছে প্রগতির ধারায় তার অনেক সংস্কার হচ্ছে, চালু হচ্ছে নতুন আইন। দেশে জবাবদিহি ও সুশাসনের লক্ষ্যে এবং জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ চালু হয়েছে। দেশে ১১৫০ আইন বলবৎ রয়েছে। বেশির ভাগ আইন চালু আছে জনগণের ওপর প্রয়োগ করার জন্য আর তথ্য অধিকার আইন হলো এমন একটি আইন– যা জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করে থাকে।

দেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে এবং জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হলে প্রশাসনের জবাবদিহি বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাস করার কথা ঘুরে ফিরে আসবে। তথ্য অধিকার আইন সমাজের জন্য, জনগণের জন্য এক ধরনের রক্ষাকবচ। যদি প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, কার্যালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগ, কার্যালয় ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা, সেবা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো নাগরিক কিছু জানতে চায় তাহলে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সে সেই চাহিত তথ্য পেতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার ভোগ করার জন্য নামমাত্র মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে একজন নাগরিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পেয়ে থাকে। তাতে করে পুরো প্রশাসনযন্ত্র পুরো জবাবদিহির মধ্যে চলে আসছে। যে-কোনো সময় যে-কোনো নাগরিক যে-কোনো অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে পারে এবং পেতে পারে। তাতে করে তথ্য লুকানোর সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি, তথ্যের অংশীদারিত্বে নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারছি। দীর্ঘকাল মনে করা হতো কোনো অফিসের তথ্য হয়ত গোপনীয়, তথ্য যে নাগরিকদের জন্যই ব্যবহার করা হয়, তথ্য জেনে নাগরিকের জীবনমান পরিবর্তন করা সম্ভব এই সুযোগই ছিল না। তথ্য অধিকার আইন চালু হওয়ার পর জনগণের সাংবিধানিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, সংবিধানের ৭(১)-এ রয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ একটি মাইলফলক ঘটনা। তথ্য কব্জা করে তা অপ্রকাশ্য রাখার যে অবস্থা ছিল তা থেকে মানবকল্যাণে তথ্যের ব্যবহার করার আইনি ব্যবস্থা দেশের মানুষকে একটি নতুন সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিটের জন্য কর্তৃপক্ষ একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে। ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪২ হাজার ২৯০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন। তবে সরকারি অনুদানকৃত স্কুল-কলেজ ও সব ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত হলে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার কথা। শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হয়ত আইনের সংশোধন প্রয়োজন হবে। সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা লক্ষাধিক ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অন্যতম নির্দেশক

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই এপ্রিল, ২০০৯ (২২শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ২০ নং আইন

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং

যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও

১৬.১০.২-এ ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকারকে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাকে নিশ্চিত করার জন্য ইউনেসকো প্রতিবেদনের সুপারিশমালায় বলা হয় যে, সরকার এই আইন প্রয়োগে তদারকি ও এসডিজি মনিটরিংয়ের জন্য তথ্য কমিশনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিত করতে পারে। এছাড়া ইউনেসকো তথ্য অধিকারে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ১৬.১০.২ নিরূপণেও পর্যবেক্ষণে মানসম্পন্ন হাতিয়ার হিসেবে আইন প্রণয়ন এবং কার্যকরণে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এক্ষেত্রে ইউনেসকো সরকারি ও সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোকে উচ্চমানসম্পন্ন, সময়োপযোগী, বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে থাকে বলে উল্লেখ করেছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গুলো হচ্ছে: দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে; অধিকাংশ জেলায় তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে; ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে; তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভাগ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে 'তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি', জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি' এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি' গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২২শে মে ২০১৮ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সম্প্রতি অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম সম্পর্কে জন অবহিতকরণ করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের ৬ই মার্চ অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হয়। ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু থাকলে তথ্যের জন্য করা আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানার সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত হবে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে প্রতিটি সংস্থার জন্য। এমন অনেক তথ্য রয়েছে যা প্রায় সব সময় অনেকের প্রয়োজন হয়। সেই সকল তথ্য বিশেষ করে ঐ সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের কার্যক্রম, সেবা ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য তৈরি করে রাখতে পারে। সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তথ্য অবমুক্ত করার নীতিমালা অনুসরণ করে সেই সকল তথ্য ওয়েবসাইট, পুস্তিকা, ফোল্ডার, লিফলেট ইত্যাদি আকারে প্রকাশ করতে পারে।

স্বচ্ছ প্রশাসন ও স্বচ্ছ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যবহার দেশের জনগণকে একটি নতুনতর অবস্থায় নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। মানব উন্নয়নের অন্যান্য সূচকগুলো যথার্থভাবে কার্যকর করতে হলে এবং দেশের জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন করতে গেলে এই আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করার এবং সেইসঙ্গে দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য অনেক বেশি মানুষকে তৎপর হতে হবে। সারা দেশের মানুষকে তথ্য চাহিদায় অংশ নিতে হবে। শুধু জনা কয়েকের প্রচেষ্টায় এই সুবিধা সর্বসাধারণের জন্য নিশ্চিত করা যাবে না। ঘরে ঘরে তথ্যপ্রাপ্তির চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। তথ্য ব্যবহারের পর্যাপ্ততা সুশাসনের নিয়ন্তা হতে পারে। এতে করে তথ্যের আদান-প্রদান যেমন বৃদ্ধি পাবে সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হবে জনগণের পারস্পরিক আস্থার। এখানেই সমাজ এবং প্রশাসনের মধ্যে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। সৃষ্টি হবে নতুন সাংস্কৃতিক বলয়ের। তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর ব্যবহার সাংস্কৃতিক জাগরণে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হবে, সরকারি ও বেসরকারি সেবা কিংবা উপকরণ সম্পর্কে তথ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, বৃদ্ধি পাবে সেবা এবং প্রাপ্তব্য উপকরণের ব্যবহারও। অতএব, তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। সমাজ-সচেতনতায় জনগণের মধ্যে তথ্যের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক কার্যক্রম এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করবে। তথ্যের চাহিদা ও সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে সাংস্কৃতিক গতিময়তা সৃষ্টি হবে, জনগণের জীবনমানেরও পরিবর্তন নিশ্চিত হবে।

প্রফেসর ড. মো. গোলাম রহমান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ও সম্পাদক, আজকের পত্রিকা, golamr07@hotmail.com

শান্তিরক্ষা পদক পেলেন দেশের ১১০ নৌসেনা

লেবাননের বৈরুতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১১০ জন সদস্য শান্তিরক্ষা পদকে ভূষিত হয়েছেন। ইউনাইটেড ন্যাশনস ইন্টারিম ফোর্স ইন লেবাননের (ইউনিফিল) মেরিটাইম টাস্কফোর্স (এমটিএফ) কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আন্দ্রেস মুগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'সংগ্রাম'-এর কর্মকর্তা ও নাবিকদের হাতে শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পদক বা মেডেল তুলে দেন।

২০শে সেপ্টেম্বর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ১৭ই সেপ্টেম্বর লেবাননের বৈরুতে মেডেল প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে লেবানন নৌবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ ক্যাপ্টেন কমোডর হাইসাম ড্যানোই ও লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান, বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদর দপ্তরের প্রতিনিধি কমোডর সৈয়দ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

মেডেল প্যারেড অনুষ্ঠানে এমটিএফ কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আন্দ্রেস মুগে শান্তিরক্ষা মিশন লেবাননে নিয়োজিত সব নৌবাহিনীর সদস্যকে সফলভাবে মিশন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ জানান। জাতিসংঘের ম্যানডেট অনুযায়ী, ইউনিফিলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাফল্যের ধারাবাহিকতার জন্য তিনি নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে আসছে। ভূমধ্যসাগরে মাল্টি ন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত রয়েছে।

প্রতিবেদন : ইসমত আরা

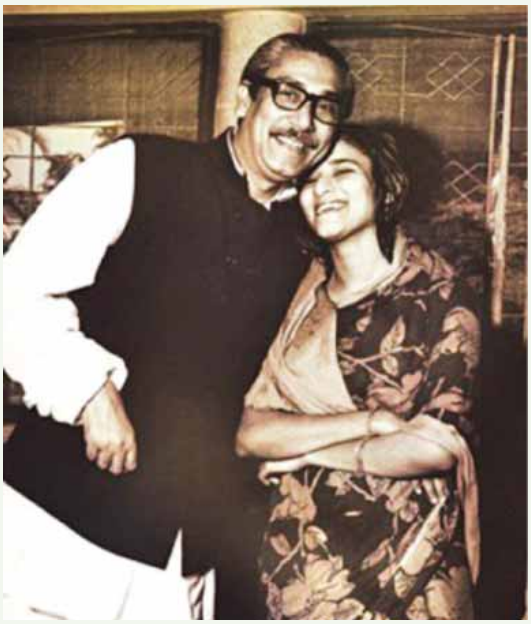

বঙ্গবন্ধুর পুনর্জন্ম

নির্মলেন্দু গুণ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাত্রি আমার জীবনকে একেবারে তছনছ করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর সপরিবার নিহত হওয়ার ঘটনাটি আমার বুকের ভেতরে একটি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে স্তূপ করে রাখা শেখ পরিবারের সদস্যদের মৃতদেহগুলো দেখার পর আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। ডোমদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে, মর্গে বঙ্গবন্ধুর লাশটি আনা হয়নি। তাঁর লাশ বত্রিশ নম্বরের বাড়িতেই পড়েছিল। সেখানে যাবার উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হই। ঐ বাড়িটি তখন সৈনিকরা পাহারা দিচ্ছিল। পরিবর্তিত ঢাকার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে আমি ব্যর্থ হই। তিন দিন তিন রাত্রি স্থান বদল করে (মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী ও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ) ঢাকায় লুকিয়ে থাকার পর আমি ঢাকা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। আমি বুঝতে পারি, এই নগরীতে আমার পক্ষে আর ঘুমানো সম্ভব হবে না। আমার ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই টিভিতে দেখা খোন্দকার মোশতাক, জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী ও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের উল্লসিত মুখ ভেসে ওঠে। ১৮ই আগস্ট রাতের ট্রেনে আমার 'হুলিয়া' কবিতার নায়কের মতো লুকিয়ে আমি আমার জন্মগ্রাম কাশবনে ফিরে যাই। আবার কখনও ঢাকায় ফিরে আসব বা ফিরে আসতে পারব এমন ধারণা বা বিশ্বাস তখন আমার ছিল না। মনে হচ্ছিল, আমি চিরদিনের জন্য আমার এই প্রিয় নগরী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যে নগরী আমাকে কবি বানিয়ে ভালোবেসে তার বুকে তুলে নিয়েছিল। আমার চারপাশে আমি একদল আততায়ীর অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকি। অচেনা মানুষদের তো বটেই, আমার খুব চেনা-জানা মানুষদেরকেও সন্দেহ হতে থাকে। আমার মনে হচ্ছিল, বঙ্গবন্ধুর আততায়ীরা আমাকে গোপনে অনুসরণ করছে। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যে বঙ্গবন্ধুর রুহুকে আমার বুকের ভেতরে গোপনে বহন করে নিয়ে চলেছি, বঙ্গবন্ধুর খুনিরা তা জেনে গিয়েছে। আমি একটু অসতর্ক হলেই, ওরা আমাকে হত্যা করবে। গ্রামের বাড়িতে মা-বাবা ও আমার ভাইবোনদের কাছে ফিরে গেলে হয়ত আমার স্বস্তি আসবে, ভয় কেটে যাবে, আমি হয়ত ঘুমাতে পারব।

কিন্তু না, গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার পরও আমার মানসিক অবস্থার উন্নতি হলো না। বরং আমার সন্দেহ তালিকায় এবার আমার আপনজনরাও যুক্ত হলো। আমি নিজে রান্না করে খেতে শুরু করলাম। অপরের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলাম। আমার মনে হতে থাকল, রাজপুটিনের মতো আমাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হতে পারে। মনে পড়ল, ঔপন্যাসিক সরদার জয়েনুদ্দিন, কবি আবদুল গনি হাজারী এবং শিল্পী কামরুল হাসান– এই তিন বন্ধু আমাকে রাজপুটিন বলে ডাকতেন। কেন ডাকতেন? তবে কি আমার জীবনের পরিণতিও রাজপুটিনের মতো হবে? আমার সন্দেহ রোগটা এমনই বেড়ে গেল যে, আমার মা-বাবা ও ভাইবোনরা কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে আমার জন্য অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

দুই

আমি দিনরাত আমাদের গ্রামের শ্মশানে, জটা চুল ও দীর্ঘ শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত জগা সাধুর আশ্রমে পড়ে থাকি। সংসারত্যাগী সদাহাস্যময় এই মানুষটাকে আমার ভালো লাগে। আমার মনে হয় এই মানুষটির দ্বারা এই সংসারের কারও কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না। বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার খবরটি সবাই জেনেছিল, কিন্তু ঐ কালরাতে বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র এবং শেখ মণির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকেও যে হত্যা করা হয়, সেই খবরটা অনেকেই জানতো না। আমার কাছে মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর, সবচেয়ে বর্বর ও অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা শুনে অনেকের চোখই অশ্রুসজল হয়। বিশেষ করে জগা সাধু বেশি কষ্ট পান। মনে হয়, আমার কষ্টের কথা ভেবে তিনি আমার চেয়েও বেশি কষ্ট পাচ্ছেন।

একদিন এক নির্জন সন্ধ্যায়, জগা সাধুর আশ্রমে শুধুই আমরা দুজন মুখোমুখি বসেছিলাম। যেন কতকাল ধরে আমরা পরস্পরের চোখে চোখ রেখে বসে আছি, কোনো এক অজানা প্রশ্নের উত্তর জানতে। বুঝলাম জগা সাধু আমাকে একা পেয়ে খুশি হয়েছেন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি তাঁর বুকের গভীরে লুকিয়ে রাখা গোপন প্রশ্নভার থেকে নিজেকে মুক্ত করে, আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, এরা তো বঙ্গবন্ধুরে মাইরা ফেলাইলো, অহন বঙ্গবন্ধু অইবো কেডা? দেশ চালাইবো কেডা?

জগা সাধুর চোখে জল। অনেকদিন পর আমার এ-ক-টু ভালো লাগল। আমি জগা সাধুকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তার লাল চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া জল মুছে দিয়ে বললাম, এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, জগাদা। ভবিষ্যৎই বলবে, বঙ্গবন্ধুর শূন্যস্থান কোনোদিন আদৌ পূরণ হবে কি না। বা পূরণ করবে কে? তবে যা বলতে পারি তাহলো, বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্রের শাসন বাংলাদেশে কখনই দীর্ঘস্থায়ী হবে না। হতে পারে না।

মুজিব হত্যার দণ্ড এড়াবে–
খুনীদের এতো সাধ্য কী?
আমি কবি, জানি
বাঙালির আরাধ্য কী।

'ইতিহাস কী লিখব মাগো, আমি তো আর শেষ জানি না'। রামপ্রসাদের সুরে রচিত আমার ঐ গানটিও আমাদের গ্রামের শ্মশানে, জগা সাধুর আশ্রমে বসেই লিখেছিলাম।

সেদিন জগা সাধুর যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার ৪৬ বছর পর, আজ বলতে পারি– বঙ্গবন্ধুর পুনর্জন্ম সাধিত হয়েছে তাঁর কন্যা বিশ্বনেত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে।

আজ জগা সাধু বেঁচে থাকলে খুশি হতেন। শুভ জন্মদিন, শেখ হাসিনা, আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

নির্মলেন্দু গুণ: বিশিষ্ট কবি

জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সংগ্রামে জাগরণে পিতা ও দুহিতা

জাফর ওয়াজেদ

জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি ঘুমন্ত বাঙালিকে। জাগরণের গান শুধু নয়, মুক্ত স্বাধীন মানুষের মতো বেঁচে থাকার মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন বজ্রকণ্ঠে ডাক মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার। প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তোলা, শত্রু হননে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান করেছিলেন। ঘুমন্ত বাঙালি জেগে উঠে হুংকারে। রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে ঘুমন্ত বাঙালি মহাজাগরণের মন্ত্রে শত্রু হননে লড়েছে বীরের বেশে। দিয়েছে প্রাণ গণহত্যার বীভৎসতায়। তবু পরাভব মানেনি। বিজয়ের পতাকা দুহাতে নিয়েছে তুলে বীর বাঙালি। সেই বীর জাতির মহান নেতা তিনি। জেল, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের নেতা পরিণত হন জাতির পিতায়। বাঙালির সহস্র বছরের আরাধ্য পুরুষ। কিন্তু সেই তিনি গ্রিক ট্র্যাজেডির মতোই বাঙালি জীবনের একমাত্র ট্র্যাজেডির মহাকাব্য হয়ে গেলেন। সপরিবার শিকার হলেন কতিপয় দুর্বৃত্তের নৃশংস রক্তলোলুপতার। শুধু প্রবাসী দুই তনয়া বেঁচে এই শোকের পাহাড় বয়ে বেড়াবার জন্য। শোকে মুহ্যমান তখন বাংলার মানুষ। কথা বলার ভাষাও ফেলেছিল হারিয়ে। মানুষের স্তব্ধতায় আতঙ্ক জাগিয়ে ঘাতকেরা হাসিল করে নিল আরও হত্যাযজ্ঞের। যাদের শ্রমে মুক্ত স্বদেশ সেই চারনেতাও জেলখানার গারদের ভেতর খুন হলেন হায়েনার নখরে। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল দেশ। যে দেশের জন্য এত যুদ্ধ, এত রক্ত, এত ক্ষয়, এত ধ্বংসযজ্ঞ– সেই দেশ, সেই স্বাধীন মুক্ত বেঁচে থাকার প্রেরণা সবই লুণ্ঠিত ধুলোয়– ইতিহাসের প্রহসন তৈরি হতে থাকে জান্তার রক্তচক্ষু শাসনে। যে শাসন-ত্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করে মুক্ত স্বদেশ এনেছিলেন, হত্যার পর সেই শাসন-ত্রাসন পুনর্বহাল হলো। প্রবাসী কন্যাদের দেশে ফেরার ওপর জারি হলো নিষেধাজ্ঞা। সংবিধান ছিন্নভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের প্রক্রিয়া শুরু। মহান নেতার আরাধ্য দেশ ছিন্নভিন্ন, অধিকারহীন মানুষ, জান্তার রক্তচক্ষু সর্বত্র, লেলিহান আগুনের ভেতর নাভিশ্বাস তোলে রাজনীতি, অবলুণ্ঠিত জাতিসত্তা, কুণ্ঠিত জীবন। অবস্থা যখন এমন, দুহিতা নির্বাসন থেকেই পিতৃ হত্যার বিচার দাবি করেন, বিশ্বমানবের কাছে। সব নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দুহিতা ফিরে এলেন নিজ মাতৃভূমে। যেখানে পিতা-মাতা-ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজনের রক্তে স্নাতভূমি। হাত ধরলেন পিতার প্রতিষ্ঠিত দলের। জাতির ভাগ্যাকাশে সঞ্চারিত হতে থাকে আশার আলো। কিন্তু পদে পদে বাধা। জেল, জুলুম, নির্যাতন কেবল নয়, 'প্রাণে বধের' নানাজাত ঘৃণ্য প্রক্রিয়াও চলে। নিহত পিতার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছিলেন, কোনোভাবেই টলবেন না। বাঙালির অধিকার আদায়ে হবেন না পিছপা। সেই শপথের পথ ধরে টানা প্রায় ত্রিশ বছর ধরে নিরলস শ্রমে নিজেকে উত্তীর্ণ করেছেন বিশ্বনেত্রীর আসনে। বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশকে একটি সম্মানজনক স্থানে নিয়ে যেতে যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তিনি সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে এগিয়ে গেছেন। এখনো শ্রমে, কর্মে, নিষ্ঠায়, কুশলতায়, আন্তরিকতায়, ঔদার্যে, একাগ্রতায় নিয়ত মানবমুক্তি ও কল্যাণে নিরলস। বাংলার প্রতি ঘর ভরে দিতে অন্ন-বস্ত্রে, প্রতিটি শিশুকে দিতে শিক্ষার আলো, চিকিৎসার সুযোগ আর প্রতি মানুষের বসবাসের নিশ্চয়তা দিতে কী অসাধ্য সাধনাই করে যাচ্ছেন এখনো।

পিতা এবং দুহিতা। পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান একদিন এনে দিয়েছিলেন এই স্বাধীন বাংলাদেশ। সেই দেশ যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম পঁচাত্তর ট্র্যাজেডির পর। হারানো দেশ ফিরিয়ে আনলেন বঙ্গবন্ধু দুহিতা জননেত্রী শেখ হাসিনা। পিতা আড়াই দশকের এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এনেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ। দুহিতা আর এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, একুশ বছর পরে হারানো দেশকে আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন। পাঁচ বছর পর সেই পুনরুদ্ধার করা দেশকে পশ্চাতে টেনে নিতে বাঙালিবিরোধী ঘাতকদের প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা শাসকেরা এক মহাযজ্ঞ শুরু করেছিল। যার রেশ চলেছে টানা সাত বছর ধরে। আবারও সংগ্রাম, জেল, জুলুম, নির্যাতন। নির্বাসন সহ্য করে বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশকে আবারও মূলধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার সমস্ত আয়োজনে ব্যাপৃত থেকে মানুষের চাহিদাকে সামনে রেখে এক উজ্জ্বল দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলার নিয়ত সাধনারত। লক্ষ্য তাঁর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া।

বিপ্লবের-সংগ্রামের অগ্নিশিখা কখনো নিভে যায় না। হয়ত স্তিমিত হয়ে আসে শুধু। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় না। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম, যুগ থেকে যুগে, নেতৃত্ব থেকে নেতৃত্বে নিজকে বহন করে চলে। পিতা মুজিবের হাত থেকে সংগ্রামের শিখা কন্যা হাসিনার হাতে। পঁচাত্তরে ঘাতকের আঘাতে তা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিভে যায়নি। ছয় বছর পরে গত শতকের একাশিতে শেখ হাসিনা এসে সেই শিখাকে আবার উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নিভতে দেননি। বাবা-মা-স্বজন হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে গেছেন পিতার প্রদর্শিত পথে। পিতা সোনার বাংলা গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁকে শেষ করতে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া সময়টা ছিল বড়োই দুঃসময়। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশে ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে দেশগড়ার কাজে এগিয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। বিশেষ করে দেশ ও দেশের বাইরে যখন স্বাধীনতার শত্রুরা হয়ে উঠেছিল প্রতিহিংসাপরায়ণ। এদেশকে কোনোমতেই মাথা তুলে

দাঁড়াতে দেওয়া যাবে না– এই হীন সংকল্প নিয়ে ছিল তৎপর।

পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করছেন পুত্রী। তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও দৃঢ়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে নিরলস যে শ্রম, তা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের পরও। এমন সিদ্ধান্ত আসে, গত চল্লিশ বছরে যে পথ পাড়ি দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা, সে পথের বিশ্লেষণে তো এটাই প্রতীয়মান যে, কী তাঁর কাজ, কীভাবে সে কাজ তিনি সমাধা করবেন, তা বঙ্গবন্ধুকন্যাকে বুঝিয়ে বলার খুব একটা দরকার হয়নি। তিনি জানেন তাঁর কাজ, চিনেন তাঁর পথ। সোনার চামচ মুখে দিয়ে শেখ হাসিনা জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর জন্ম হয়েছিল এদেশেরই এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। এদেশের দুঃখী মানুষের, মাটির মানুষের মাঝে, এক সংগ্রামী পিতার ঘরে। বুঝবার বয়স থেকে তিনি শুনে এসেছেন দেশের কথা, দেশের মানুষের অধিকারের সংগ্রামের কথা। জনজীবনকে দেখেছেন অতি কাছ থেকে। অনুভব করেছেন নিবিড়ভাবে। পিতাকে বার বার কারাগারে যেতে দেখেছেন। তাঁর অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। একই সঙ্গে সংগ্রামী পিতার জন্য গর্ববোধ করেছেন। এ দেশের মাটি ও মানুষের স্পর্শ নিয়েই তাঁর ধ্যান-ধারণায়, দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর মূল্যায়ণে কোনো অস্পষ্টতা আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। সব কন্যার প্রতি সব পিতারই স্নেহাতিশয্য থাকে। বঙ্গবন্ধুও তাঁর প্রথমা কন্যাকে খুব বেশি স্নেহ-মমতা দিয়ে ঘিরে রাখতেন। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে একদিন তাঁর সংগ্রামী ঐতিহ্যকে কোনো অন্যায়কারী অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির কাছে মাথা নত না করার আদর্শকে, তাঁর রাজনীতিকে বহন করে নিয়ে যাবে স্নেহধন্যা এই কন্যা? আলোকচিত্রে তাকালে এখন দেখা যায়, কন্যার মাথায় হাত রেখে বঙ্গবন্ধু আশীর্বাদ করছেন। তিনি তো জানতেন, তাঁর কন্যা ষাটের দশকে, যখন তিনি জেলে, পিতার মুক্তির দাবিতে ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে, কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহ-সভাপতির দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেছে। এমনকি গণ-অভ্যুত্থানের সময় মিছিলে নেতৃত্ব শুধু নয়, স্লোগানও তুলেছেন। বঙ্গবন্ধুর শিল্পসাহিত্য প্রীতির প্রভাবে তাঁর তনয়া সাহিত্যের শিক্ষার্থী ছিলেন। বাংলা সাহিত্য থেকে বিশ্ব সাহিত্য শুধু নয়, দর্শন, ধর্মতত্ত্বও তাঁর পাঠ্যসূচি থেকে বাদ নেই। কোনো বিষয়কেই তুচ্ছ করে না দেখা, সব বিষয়ে জানা শোনার পরিধি যতই বেড়েছে রাষ্ট্র ও দল পরিচালনায় দৃষ্টিভঙ্গিও বদলেছে। পিতা রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্তর কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করতেন ভরাট কণ্ঠে। কন্যার পাঠ্য তালিকার পরিধিতে এই একুশ শতকের সর্বশেষ ভাবনা, চিন্তা, বিশ্বমানবের উত্থানের গতি-প্রকৃতি, দারিদ্র্য বিমোচনও রয়েছে।

সেই একদিন এসেছিল আশি দশকের প্রারম্ভে। নির্বাসন জীবন ছেড়ে ফিরে এলেন কন্যা শেখ হাসিনা। নির্দ্বিধায়, নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে এলেন পিতার ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যেতে। তাঁর সোনার বাংলার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে। কী আশ্চর্য মিল, অভিন্নতা পিতা-পুত্রীর সংগ্রামী কর্মধারায়। একাত্তরে স্বৈরাচারী সামরিক শক্তি যখন গণরায় মেনে নিতে চাইল না তখন বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। জনগণ ছাড়া আর কোনো শক্তি, কোনো বন্দুক-কামান তাঁর ছিল না। এই গণশক্তির জোরেই সেদিনের স্বৈরশক্তিকে তিনি শাসিয়ে ছিলেন 'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।' দেশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন– 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। ... তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' বলেছিলেন– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।' একটা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা আর কীভাবে হতে পারে?

পঁচিশ বছর পর এ দেশের মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার আদায় করতে গিয়ে কন্যা শেখ হাসিনাও অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন ১৯৯৫ সালে। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে 'গণকারফিউ' ঘোষণা করেছিলেন। তবে তাঁর ঘোষিত এই 'কারফিউ' কার্যকর করার জন্য কোনো পুলিশ-বিডিআর-আনসারের প্রয়োজন পড়েনি। জনগণ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভোট কেন্দ্রে যায়নি। শতকরা পাঁচজনও ভোট দেয়নি। অথচ তিন মাস পর ১২ই জুনের নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৭৩ শতাংশ। পিতার মতোই তিনি জানেন গণজাগরণ কীভাবে ঘটাতে হয়। আন্দোলন শুরু করে কখন কোনখানে এসে থামতে হয়, তা-ও জানেন। তবু তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে, এখনো হয় ঘাতকের গুপ্ত চক্রান্ত। প্রকাশ্য জনসভায় গ্রেনেড নিক্ষেপ হত্যা করার মতো জঘন্য নারকীয় ঘটনা ঘটে। গত ত্রিশ বছরে শেখ হাসিনার প্রাণনাশের বহু চেষ্টা, অপচেষ্টা, ষড়যন্ত্র হয়েছে। যা থেকে মুক্ত নন এখনো, কখনো। যারা জাতির পিতাকে সপরিবার হত্যা করেছে, তাঁদের বশংবদরা এখনো তৎপর। তাই ২০০১ সালে গণরায় বদলে যায়। নিপীড়ন, নির্যাতন যেন একাত্তরের পাকিস্তানি বাহিনীর বীভৎসতাকে ধারণ করে। অগণতান্ত্রিক পথ ও পন্থার বিস্তার ঘটে। কণ্ঠরোধ, হামলা, মামলা সবই চলে। হয়রানির নানা কৌশল নেওয়ার পর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হত্যার চেষ্টা হয়। যে দুর্ঘটনায় জননেত্রী আইভি রহমানসহ বহু প্রাণহানি ঘটে। শেখ হাসিনার শ্রবণেন্দ্রিয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার চিকিৎসা এখনো চলছে। ১৫ই আগস্ট, আর ২১শে আগস্টের ক্ষত বয়ে বেড়াতে হয় এখনো।

ষড়যন্ত্রের ঘনঘটায় ২০০৭ সালে শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করার গভীর ষড়যন্ত্র নানা কৌশল ব্যর্থ হয়ে জেলবন্দি করে নির্জন সেলে রাখে। কিন্তু জেলবন্দি শেখ হাসিনা

যেন আরও দ্বিগুণ শক্তি ও সমর্থন নিয়ে বাংলার মানুষের কাছে প্রতিভাত হলেন। শাসকেরা দেশে ফেরার পথ আবারও বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু গণরায় এবং শেখ হাসিনার সাহস দৃঢ়তা বাঁধভাঙা জোয়ারে ভেস্তে যায়। সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত একাই মোকাবিলা করেছেন জনগণের সমর্থন নিয়ে। বাংলার মানুষ তাকিয়ে ছিল তাঁর অধিকার ফিরে পাবার আশায় তাঁর কারামুক্তির জন্য। অভিন্ন দৃশ্য পিতার জীবনেতিহাসেও। পাকহানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে নির্জন কারাগারে ফাঁসির প্রকোষ্ঠে রেখেছিলেন একাত্তরের পুরো নয় মাস। কবর পর্যন্ত খুঁড়েছিল। কিন্তু হত্যা করার দুঃসাধ্য হয়নি পাকস্তানি জান্তার। বরং কারাবন্দি বঙ্গবন্ধুর নামে দ্বিগুণ শক্তিতে বাংলার মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

পিতা ও পুত্রী যে আদর্শের জন্য লড়াই-সংগ্রাম-জীবন উৎসর্গ করেছেন, সে আদর্শ তো সকল পরাধীনতা, দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অশিক্ষা, কুসংস্কার থেকে জাতিকে মুক্ত করে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা; বাংলার মানুষকে সচ্ছল করা। পিতা এলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি নিলেও ঘাতকরা তা বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়নি। পুত্রী বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পিতা যেমন জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন, পুত্রীও তাই। জাতির পিতার হত্যার বিচার চেয়েছিলেন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সেই হত্যার বিচার হয়েছে, খুনিদের একাংশের ফাঁসি হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তিনি দীর্ঘদিন ধরে চেয়ে আসছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের মতোই। সেই বিচারের লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনালও গঠন করেছেন। শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি হয়েছে। এখন বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের নিরূপণে এগিয়ে এসেছেন। জনহিতকর চেতনায় কর্মসূচি নিয়েছেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। 'বাংলার মাটি, বাংলার ফল, বাংলার বায়ু, বাংলার জল'-এ বেড়ে ওঠা শেখ হাসিনা মাটি ও মানুষের মধ্যে জীবনের উৎসারণ ঘটিয়েছেন।

জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কোনো সময়ই দূরের মনে হয় না। মনে হয় যে, আমাদের বোন, আমাদের অগ্রজা। সুশীতল বটবৃক্ষের মতো মাথার ওপরে, নিচে আশ্রিতজনেরা তাতে পরম শান্তি খুঁজে নেয়। বিধবা, বয়স্কা কিংবা দরিদ্র কৃষকের কাছে কিংবা এখনো খেয়াঘাটে নৌকো পারাপার করে যে মাঝি তাদের কাছেও তিনি অতি আপনজন 'শেখের বেটি'। গ্রামবাংলার মাঠঘাট-প্রান্তরজুড়ে তাঁর দৃষ্টি অবিরল খুঁজে দরিদ্র বাঙালি কৃষক, মজুরের জীবন থেকে দারিদ্র্যের ছাপ মুছে দিতে। কিষান-কিষানির মুখে দুমুঠো অন্ন দিতে, পিতা যেমনটি চেয়েছিলেন। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান। পিতার সোনার বাংলা গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টা মাইলফলক হয়ে বিস্তার ঘটাবে বিশ্ব মানচিত্রে বাঙালি জাতির সাফল্য। জাতি হিসেবে উন্নততর চিন্তার অধিকারী হয়ে উঠুক বাঙালি– শেখ হাসিনার চাওয়া তো তাই।

১৯৮১ সাল থেকে নবতর যাত্রা শুরু করে চল্লিশ বছরের চলার পথে যে অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়েছে, তাই তাঁকে দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনায়, দল সংগঠিত করায় শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছে। উত্তরণ ঘটেছে ক্রমান্বয়ে রাজনীতিবিদ থেকে প্রাজ্ঞজনে, পলিটিশিয়ান থেকে স্টেটসম্যানে। আর এই স্টেটসম্যানশিপ শেখ হাসিনাকে জননেত্রী থেকে বিশ্বনেত্রীতে পরিণত করেছে। পিতা ও দুহিতা– আমাদের কালে যে পথের নিশানা দিয়েছেন, সেই পথই তো চাওয়া হয়েছিল সেই ষাটের দশক থেকে। আর সেই পথের দিশা নিয়েই তো ষাট, সত্তর দশক পেরিয়ে একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতি যখন ফিরে তাকায়– তখন ভেসে ওঠে শুধু পিতা বঙ্গবন্ধু এবং দুহিতা শেখ হাসিনার অবয়ব।

বাংলাদেশকে তিনি উন্নয়নশীল দেশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ববাসী অবাক তাকিয়ে, কী করে বাংলাদেশ হতশ্রীদরিদ্র দেশ থেকে আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল। উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখায় তিনি পেয়েছেন অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও পদক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে সেপ্টেম্বর পঁচাত্তর বছরে পা দেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধুর গড়া আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দৃঢ় নেতৃত্বে গত চল্লিশ বছরে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। এবারের জন্মদিন বাঙালি জাতিকে বিকশিত হওয়ার প্রেরণা জোগাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে, উন্নয়নশীল দেশের পথে উন্নীত করার দৃঢ়তায়। জন্মদিনে থাকুক অমলিন শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা।

জাফর ওয়াজেদ: কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আইটিইউ সদস্যপদ অর্জনের ৪৮তম বার্ষিকী উপলক্ষে ডাকটিকিট অবমুক্ত

জাতিসংঘের টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষায়িত সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর সদস্যপদ অর্জনের ৪৮তম বার্ষিকী। ১৯৭৩ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ আইটিইউ-এর সদস্যপদ লাভ করে– উন্মোচিত হয় টেলিযোগাযোগ দুনিয়ায় সাথে বাংলাদেশের স্বর্ণালি দ্বার। দিবসটি উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম ও ডাটা কার্ড প্রকাশ করেছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় তাঁর দপ্তর থেকে এ উপলক্ষে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট ও ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। এছাড়া ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটাকার্ড উদ্‌বোধন করা হয়। মন্ত্রী এসময় একটি বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ১২ বছরে বাংলাদেশকে অগ্রগতির পথে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০১০ সালে এবং ২০১৪ সালে বাংলাদেশ আইটিইউ-এর কাউন্সিল সদস্যপদে নির্বাচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প এবং ২০১৮ সালে সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফরম (সিবিভিএমপি) সল্যুশনটি আইটিইউ টেলিকম অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। এছাড়াও ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোগ 'উইসিস 'পুরস্কার পেয়ে আসছে।

প্রতিবেদন : জে আর পঙ্কজ

দেশরত্ন শেখ হাসিনা: অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব

প্রফেসর ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব। ঘাতকের নির্মম বুলেট শারীরিকভাবে তাঁকে কেড়ে নিতে পারলেও তাঁর শাশ্বত আদর্শ, কালজয়ী নেতৃত্বের গুণাবলি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা চিরঞ্জীব। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্পন্ন মানুষের সহজাত গুণ হচ্ছে দেশপ্রেম, সততা, বিনয় ও মানবিক মূল্যবোধ। আর তাই এই আদর্শ ও চেতনার দ্বারা নিজেকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রজন্মের জন্য একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব থাকা অপরিহার্য। যার জীবনযাপন ও কর্মকাণ্ড দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশপ্রেম, সততা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। এ ধরনের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বা রোল মডেলের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি হচ্ছে– আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি; যিনি সৎ ও দেশপ্রেমিক; দেশ ও জাতির প্রতি যিনি অঙ্গীকারবদ্ধ; বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের

চেতনার প্রতি যার আপোশহীন অঙ্গীকার; গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি যিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বাগ্রে যাঁর নাম আসে তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন, সকালে ঘুম থেকে ওঠা, নিজের কাজ নিজে করা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, বই পড়া, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, গরিবদুখি অসহায় মানুষের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সৎভাবে চলা, দায়িত্ব সচেতনতা, আন্তরিক, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, দেশের উন্নয়নে যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্ষমতার প্রমাণ রাখা, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনা, সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণাবলি খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রজন্মের জন্য অনুসরণযোগ্য। আর এসব কারণেই তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন নেছার পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম সন্তান বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু যখন প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন তখন তাঁদের পরিবার ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ছাত্রজীবনে শেখ হাসিনা ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে এবং ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। শেখ হাসিনা ঢাকার তৎকালীন গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ (বর্তমান বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ) ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়া তিনি ঐ কলেজ ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন এবং রোকেয়া হল ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি খ্যাতনামা পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭১ সালের ২৭শে জুলাই তাঁদের প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান সায়মা ওয়াজেদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৯ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার পুরো পরিবারকে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। তিনি ও তাঁর ছোটো বোন বিদেশে থাকার কারণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুর জীবিত দুই কন্যা এবং তাঁদের পরিবারবর্গ দিল্লি পৌঁছান। প্রায় ছয় বছর তিনি ভারতে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এসময় জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে পার্টির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এর তিন মাস পরে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তিনি সরাসরি দিল্লি থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশ ফিরে আসার পর থেকেই শুরু হয়েছিল দেশরত্ন শেখ হাসিনার সংগ্রামবহুল আর এক জীবন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৮২ সাল থেকেই তিনি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ শুরু করেন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরায় শুরু করার জন্য তিনি এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ১৫-দলীয় ঐক্যজোট সংগঠিত করেন। এই ঐক্যজোটের কারণেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠা সামরিক শাসনবিরোধী তীব্র ছাত্র আন্দোলন দমানোর জন্য ১৯৮৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে নির্বিচারে লাঠি চার্জ ও গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ১৯৮৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৫-দলীয় ঐক্যজোটের এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বের হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে চোখ বেঁধে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেনানিবাসে তাঁকে ১৫ দিন বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এবং নভেম্বরে তাঁকে গৃহবন্দি করে

রাখা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একনাগাড়ে তিনমাস কারাবন্দি করে রাখা হয়েছিল।

২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টাসহ ১৯ বারেরও বেশি তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। মহান স্রষ্টার অসীম করুণা, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের প্রচেষ্টা এবং জনগণের ভালোবাসার কারণে এসব আক্রমণের হাত থেকে তিনি বেঁচে গিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন শেখ হাসিনাকে এ পর্যন্ত অসংখ্য সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেছে।

১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ইনডেমনিটি অ্যাক্ট জারির একমাত্র লক্ষ্য ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে যাতে কোনো আইনগত পদক্ষেপ গৃহীত না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। দেশে অপরাধ করে দায়মুক্তি-সংস্কৃতির এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার ফলে সহিংসতার সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়, যা আত্মস্বীকৃত খুনিদেরকে বিচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের পর ২৩শে জুন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর 'বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার'-এর পথ সুগম হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর তৎকালীন আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু দ্য ইনডেমনিটি রিপিল অ্যাক্ট ১৯৯৬ শিরোনামে একটি বিল সংসদে উত্থাপন করেন। ঐদিনই মানবতাবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল হয়। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এই বিলে সম্মতি প্রদান করেন।

১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ঢাকার দায়রা জজ গোলাম রসুল ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রায় প্রকাশ করেন। আপিল নিষ্পত্তির পর ২০০০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর এই মামলায় বিভক্ত রায় আসে বিচারপতিদের কাছ থেকে। বিচারপতি মো. রুহুল আমিন ১০ জন আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। অপরপক্ষে, বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ১৫ জন আসামির ফাঁসির আদেশই বহাল রাখেন।

২০০১ সালের ৩০শে এপ্রিল হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চের বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ১২ জন আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে তিনজনকে খালাস দেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডের রায় আংশিক কার্যকর হয় ২০১০ সালের ২৭শে জানুয়ারি দিবাগত রাতে। সে রাতে খুনি সৈয়দ ফারুক রহমান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ, সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান ও মহিউদ্দিন আহমেদকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয়। আজিজ পাশা মারা যায় জিম্বাবুয়েতে ২০০২ সালে। অবশিষ্ট ৬ জন এখনো পলাতক বা রাজনৈতিক আশ্রয়ে বিভিন্ন দেশে রয়েছে। অতি সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপন করে থাকা ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ দেশে আসার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। এরপর আদালত কর্তৃক ঘোষিত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের সাজা বাস্তবায়ন করা হয়।

২০০৮ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনি ইশতাহার প্রকাশ করে তাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয় অর্জনের পর যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করে। ইতোমধ্যে কয়েকজন কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীর দণ্ড কার্যকর হয়েছে। অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীর বিচার কার্যক্রম চলছে।

অব্যাহতভাবে সংগ্রাম করে দেশরত্ন শেখ হাসিনা প্রথমে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকাকালে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এবং যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার ছাড়াও দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে গিয়েছেন। দারিদ্র্যের হার হ্রাসকরণ, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন সূচকগুলোতে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করার ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। এমনকি বিশ্বের জনপ্রিয় ফোর্বস ম্যাগাজিন করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সফল নারী নেতৃত্বের তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম স্থান পেয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরুতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা এখনো এমনকি যুক্তরাজ্যও কার্যকর করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের প্রশংসা করে লিখেছে, প্রায় ১৬ কোটিরও বেশি মানুষের বসবাস বাংলাদেশে। সেখানে দুর্যোগ কোনো নতুন ঘটনা নয়। আর এই করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি তিনি। তাঁর এই ত্বরিত সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম বিষয়টিকে প্রশংসিত বলে উল্লেখ করেছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ চলাকালে ২০২০ সালের ১৯শে মে সাইক্লোন আম্ফান বাংলাদেশে আঘাত হানে। এসময় উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনকে সরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় তথা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাংলাদেশ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্যমান ৪,১৭১টি আশ্রয়কেন্দ্রের অতিরিক্ত ১০,৫০০ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। এভাবে একসঙ্গে দুটি মহাবিপদ থেকে উপকূলীয় মানুষের জীবন রক্ষা করে একটি অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার।

এসব গুণ, বৈশিষ্ট্য ও ঘটনাবলির পাশাপাশি সাম্প্রতিককালের দুটি বিষয় প্রজন্মের অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে দেশরত্ন শেখ হাসিনার

অবস্থানের অনন্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কিশোরী মামিজা রহমান রায়ার মা নাবিহা রহমান পিংকীর মোবাইল ফোনে ভিডিও কল করেন। কিশোরী রায়া ভিডিও কলে প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় সংগীত গেয়ে শোনান। রায়ার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীও জাতীয় সংগীতে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। এছাড়া রায়া প্রধানমন্ত্রীকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন বলেও জানা গেছে। রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে একজন অটিস্টিক শিশুর সঙ্গে এভাবে আন্তরিকতাপূর্ণভাবে কথা বলা সত্যিই অনন্য।

দেশপ্রেম, সততা, মানবিকতা, আন্তরিকতা, সকলের প্রতি সৌজন্যবোধ, অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার শিক্ষা শেখ হাসিনা কোথা থেকে লাভ করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর নিজের কথা থেকেই আমরা জানতে পারি। একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার বাবার নির্দেশ ছিল, একজন রিকশাওয়ালাকে আপনি করে কথা বলতে হবে, বাড়ির ড্রাইভারকে ড্রাইভার সাহেব বলতে হবে। আর কাজের যারা লোকজন তাদের কখনো চাকর-বাকর বলা যাবে না, হুকুম দেওয়া যাবে না। তাদের কাছে সম্মান করে ভদ্রভাবে চাইতে হবে। ... যতদূর পারি নিজে করে খাই আর যদি চাইতে হয় তাহলে কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে এইটা একটু দিতে পারবে ? এই শিক্ষাটা আমরা নিয়ে আসছি, এটা এখনও আমরা মেনে চলি। এটা আমার বাবারই শিক্ষা। তিনি শুধু বলে গেছেন তা নয়, তিনি সে শিক্ষাটা আমাদের দিয়েও গেছেন, আমরা দিয়ে যাই। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমরা মনে করি যে, সকলেই মানুষ। গরিব দেখলে বা ভালো পোশাক না পড়লে তাকে অবহেলা করতে হবে আমাদের কাছে কিন্তু সেটা না। আমাদের কাছে সবাই সমান সমাদর পায় বরং যাদের কিছু নাই তাদের দিকে আমরা একটু বেশি নজর দেই, দৃষ্টি দেই।

আর জিজ্ঞাসা করছেন যে সকালে উঠে আমি কী খুঁজি? আমি জায়নামাজ খুঁজি। সকালে উঠে নামাজ পড়ি। নামাজ পড়ার পর কোরান তেলাওয়াত করি। তারপরে এককাপ চা নিজে বানিয়েই খাই। চা বানাই কফি বানাই যা আমি নিজে বানিয়ে খাই। ...এক অনন্য সাধারণ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অতি সাধারণ ও প্রজন্মের জন্য অনুসরণযোগ্য জীবনযাপনের কাহিনি।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অতি সাধারণ জীবনযাপন এবং সেইসঙ্গে হাজারো রাজনৈতিক বৈরিতা, প্রতিকূলতা তাঁকে ঠেকাতে পারেনি। জাতির পিতার স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' গড়ার দৃঢ়প্রত্যয়ে শেখ হাসিনা নিয়েছেন বড়ো বড়ো চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে স্বপ্নের 'পদ্মা সেতু' প্রকল্প বাস্তবায়ন অন্যতম। যে পদ্মা সেতু নির্মাণে ছিল আন্তর্জাতিক মহলের ষড়যন্ত্রসহ শত দেশীয় রাজনৈতিক বাধা-বিপত্তি। আজ পদ্মা সেতু উত্তাল পদ্মার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ প্রকল্পের কাজসহ ১০টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ। বাংলাদেশ আজ তাঁরই নেতৃত্বে বিদ্যুৎ, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরিশেষে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনুযায়ী প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য দেশরত্ন শেখ হাসিনা প্রকৃতই অনন্য এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

প্রফেসর ড. অরুণ কুমার গোস্বামী: তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ; ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ; চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও পরিচালক, সাউথ এশিয়ান স্টাডি সার্কেল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, drgoswamikhalia@gmail.com

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাসেল কর্নার

বঙ্গবন্ধু সপরিবার সেনা সদস্য দ্বারা নিহত হন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। হত্যা করা হয় তাঁর শিশুপুত্র রাসেলকেও। এই হত্যাকাণ্ডের শিকার আরও দুই শিশু বেবী ও আরিফ। ভয়াবহ এই ঘটনাপ্রবাহ ও স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অবদান শিশুদের মধ্যে তুলে ধরার জন্য দেশের সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাসেল শিশু কর্নার' প্রতিষ্ঠা করবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের জীবন, রাসেলের শিক্ষা এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে রাসেল ছাড়াও নিহত শিশু বেবী সেরনিয়াবাত ও আরিফ সেরনিয়াবাতের নামে বৃত্তি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই বৈঠকে। রাসেল ছাড়াও ১৫ই আগস্টের কালরাতে নিহত এসব শিশুর সহপাঠীদের খুঁজে বের করে তাদের স্মৃতিচারণনির্ভর ডকুমেন্টারি বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

রাসেলের বয়সের কথা বিবেচনা করে শিশুদের মাঝে রাসেলের জীবন ও ত্যাগের বিষয় তুলে ধরার জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করবে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অধীনে এটুআই প্রকল্প এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এ ওয়েবসাইটে শিশুদের যাদের এখনো হাতেখড়ি হয়নি বা অক্ষর চেনে না তাদের অক্ষর জ্ঞান সংবলিত রাসেলের নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান লাভের জন্য এ ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এসব শিশুকে উপযোগী করে গেম তৈরির সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। যাতে খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা লেখাপড়া শিখতে পারে। এ বিষয়ে যারা ভালো করবে তাদের জন্য রাসেলের জন্মদিনে পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করবে।

রাজধানী ঢাকায় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে ১৮ই অক্টোবর দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দিয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শক্রমে এ পুরস্কার চালু করা হয়। ওই স্কুল পরিচালিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জাতীয় ভিত্তিতে সরকারিভাবে দেশব্যাপী এ কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবেদনে : ইশরাত হক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকার পিটিআই অডিটোরিয়ামে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

আলোকের ঝরনাধারা

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শেখ হাসিনা

প্রফেসর ড. দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে জাতি হিসেবে আমরা গৌরববোধ করতে পারি– গত একযুগে বাংলাদেশের এমন অনেক অর্জন ঘটেছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের এই অর্জন সারা বিশ্বে উন্নয়নের আদর্শ উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই কালপর্বে শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি বিভিন্ন পরিসংখ্যান চিত্রকে ভিত্তি ধরে এক কথায় বলা যায় বিস্ময়কর। সাম্প্রতিক দশকে শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের এই উন্নয়ন একজন সরকারপ্রধানের অনন্য প্রজ্ঞা, দেশ আর দেশের মানুষের প্রতি অনিঃশেষ ভালোবাসা এবং ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে জন-চৈতন্যকে আলোকদীপ্ত করার অনমনীয় প্রতিজ্ঞার ফসল। স্বপ্নের যে রংধনু দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সোনালি অতীত আর সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ এক সুতোয় গেঁথেছিলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সেই রংধনু, আলোর স্বরলিপি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকার। বাংলার আদি ছন্দ পয়ারের সাঁকো বেয়ে যেন তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন নক্ষত্রের দিগন্তের দিকে। তাঁর দুপায়ে আলোর ঘুঙুর। শিক্ষাচিন্তায় তাঁর মননের যে মানচিত্র প্রতিভাসিত হয় তার অনেকটা উত্তরাধিকার; বাকিটা তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি ও উপলব্ধিসঞ্জাত। একজন মানুষ হিসেবে তাঁর সংবেদনশীলতা প্রখর, মমতা ও মানবিকতাবোধ গভীর। প্রান্তিক মানুষের আশ্রয়ণ, ক্ষুধামুক্তি, সাক্ষরতা সবসময় তাঁর চিন্তায় প্রধান বিষয় হয়ে আছে। মহাত্মা গান্ধীর 'লাস্টম্যান' কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীনের হতে দীন যে মানুষ তারাই বাংলাদেশজুড়ে বঙ্গবন্ধুর দুখি মানুষ, শোষিত মানুষ। সবার পিছে থাকা এই মানুষদের পরম আশ্রয় আর নির্ভরতার ঠিকানা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিবন্ধী, পথশিশু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী কিংবা আর্থসামাজিকভাবে বঞ্চিত ছেলেমেয়ে কেউই তাঁর স্নেহসিক্ত দৃষ্টিসীমার বাইরে নয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষাচিন্তার মূলে রয়েছে এ দেশের মানুষকে চৈতন্যে, দক্ষতায়, মানবিকতায় এমন এক উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দেওয়া যা পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশকে অনন্য করে তোলে। ক্রমাগত নানা ষড়যন্ত্র আর বার বার মৃত্যুর ছোবল অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তিনি আগলে রেখেছেন। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে জমে থাকা জঞ্জাল সরিয়ে উন্নয়নযাত্রায় তিনি জাতিকে একত্রিত ও সংহত করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের মর্যাদা দান তাঁর রাষ্ট্র-সাধনার মূলকথা। পৃথিবীতে বাংলাদেশ সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক– দূরগামী এই লক্ষ্য সামনে রেখেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে উপযোগী করে তোলার জন্য তিনি বার বার উদ্যোগ নিয়েছেন।

বাংলাদেশে শিক্ষা-আয়োজনের পরিমাণগত সম্প্রসারণের বিপরীতে শিক্ষার গুণগত মান সমান্তরালভাবে এগোয়নি বলে এতকাল নানা মহলে একইসঙ্গে এক ধরনের অসন্তোষ এবং স্বপ্ন ঘনীভূত হচ্ছিল। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরের রূপরেখা ঘোষিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে সেই অসন্তোষ এবং এর উদ্ধৃত তৈরি হওয়ার মুহূর্তটি ডুবে গেল। ঘোষিত রূপরেখার ভেতরে যারা নিজেদের স্বপ্নের শিক্ষাব্যবস্থার অনুরণন শুনতে পেলেন তাদের প্রশান্তির সময় এটি নয়। রূপরেখা একটি সুযোগ তাতে শিক্ষাবিষয়ক জন-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তি-জ্ঞান, গবেষণার ফলাফল, বিকল্প ভাবনা যোগ করার পরিসর নিশ্চয়ই রয়েছে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে একটি ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। নতুন তথ্যপ্রযুক্তি এবং ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠা উত্তরাধুনিক জ্ঞান-প্রতিবেশ বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আলোকায়নের পর ইউরোপে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার যে ধ্রুপদী অবকাঠামো গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে, প্রধানত তারই আদলে উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায়। ১৯৬০-এর দশক থেকেই এই ধ্রুপদী শিক্ষা কাঠামোতে ভাঙনের রেখা স্পষ্ট হয়েছে। শিক্ষাদর্শন, শিক্ষণ আয়োজন এবং শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। প্রস্তুত জ্ঞানের সহজলভ্যতা, দৃশ্য সংস্কৃতি'র (Visual culture) উত্থান, ভার্চুয়াল পরিসরে ডায়ালগ বা কথোপকথনের সুযোগ ইত্যাদি কারণে শিক্ষায়তন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রচলিত সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত

ড. কুদরত-ই-খুদার কাছ থেকে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পরিবর্তনের জন্য যে নতুন রূপরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তার ভেতরে এসব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচিত হয়েছে এবং এগুলোর জন্য লক্ষ্য ও কর্মকৌশল নির্ধারিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায়।

দুই

একটি মুক্তিদায়ী (Liberating) শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসের ভেতরেই নিহিত রয়েছে। একজন ব্যক্তি কিংবা একটি রাষ্ট্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই তার চারপাশের বাস্তবতার ভেতরে অভিযোজিত হয়। এই অভিযোজন মুক্তির প্রাথমিক স্তর মাত্র। মানুষের কেবল বেঁচে থাকাই বড়ো কথা নয়। প্রাণী হিসেবে মানুষ সম্ভাবনার বিপুল আধার। শিক্ষা এই সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়, তার চেতনা জাগায় এবং এভাবে মানুষের আত্ম-সাক্ষরতা তৈরি হয়। এটা মুক্তির দ্বিতীয় সোপান। মুক্তির তৃতীয় স্তরে মানুষ বিবেকবান; স্বাধীনভাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভের ভেদ রেখা নির্ণয় করতে পারে, দেশ জাতির মঙ্গলের জন্য তার সক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে পারে। মুক্তির চতুর্থ সোপানে এসে মানুষ জগৎ-সত্যকে বুঝতে পারে এবং এর ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, হিংসা, হানাহানির ঊর্ধ্বে উঠে এক পরম মানবিক বোধে পৌঁছে যায়। শিক্ষার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক দায় আছে বটে এবং সেগুলোর গুরুত্বও অনেক, তবে শিক্ষার মানবিক দায়টিই সবচেয়ে বড়ো। মুক্তির এসব ব্যঞ্জনা একসঙ্গে মিশেই শিক্ষা একটি মুক্তিদায়ী প্রক্রিয়া।

মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল কেবল একটি স্বাধীন ভূখণ্ড অর্জন নয়; বরং বাঙালির আবহমান শ্রেয়বোধের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। মুক্তিযুদ্ধের অগ্রনায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু জানতেন একটি মুক্তিদায়ী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই লক্ষ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব। বঙ্গবন্ধু সারাটি জীবন স্বাধীন বাংলাদেশের সাধনায় ব্যয় করেছেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক। এই স্বাধীন দেশের চূড়ান্ত লক্ষ্যটি কী হবে, কোন পথে সেই অভীষ্টে পৌঁছে দেবেন দেশকে– এর সবই বঙ্গবন্ধু নির্ধারণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার দর্শন এবং কাঠামোগত আয়োজন কেমন হবে তার নির্দেশনা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকেই নিতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা রূপান্তরের প্রসঙ্গ এলেই অনিবার্যভাবেই বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের প্রসঙ্গটিও সামনে চলে আসে।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন তাঁর বৃহত্তর রাজনৈতিক দর্শনের থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরং বলা যায় এর প্রায়োগিক প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব বাঙালির জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষা আন্দোলন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষাবিষয়ক বঙ্গবন্ধুর চিন্তা তাঁর বিভিন্ন ভাষণে ছড়িয়ে আছে। এসব চিন্তা সংগ্রথিত করে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের একটি পরিপূর্ণ রূপ তুলে ধরার চেষ্টা অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিই করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের মৌলিক দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে– তা কতটা গভীর, প্রাসঙ্গিক এবং সুদূরপ্রসারী। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপান্তরের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই লক্ষ্য উপনিবেশমুক্ত, দারিদ্র্য-বঞ্চনা-শোষণমুক্ত, সমৃদ্ধ, সুখী ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। তিনি এই সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চেয়েছেন। শিক্ষা হচ্ছে তাঁর সেই সোনার মানুষ গড়ার উপায়।

এই যে মানুষের কথা বলা হচ্ছে তার আত্ম-প্রতিকৃতির স্বরূপটি কেমন হবে? এরও অণুবিচ্ছুরণ জাতির পিতার শিক্ষাভাবনার ভেতরে রয়ে গেছে। আমাদের সংস্কৃতির ভেতরে 'মানুষ' সম্পর্কিত ধারণাটি নানা আধ্যাত্মিক এবং আধুনিক চিন্তাপ্রবাহ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে যে বোধ ও জাগরণের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়, স্বীকার করতেই হবে তাও বাংলাদেশে 'মানুষ' ধারণাটিকে অন্বিত করে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই ব্যাখ্যাটুকু খুবই ছোটো তারপরও বলা যায় বঙ্গবন্ধুর সোনার মানুষ বঙ্গবন্ধুরই আত্ম-প্রতিকৃতি। এই মানুষ নিজের ভেতরে ধারণ করেন আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা ভুবন-দৃষ্টি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা; সমন্বিত অধ্যাত্ম আর পরধর্ম সহিষ্ণুতার ফল হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা। দেশের সঙ্গে, দেশের সানুষের সঙ্গে এ মানুষের হৃদয়ের যোগ গভীর, অশুভ আর অকল্যাণ দূর করার জন্য তাঁর সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ প্রশ্নাতীত।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের অলোচনায় যে কথাটি একেবারেই উচ্চারিত হয়নি, সেটি হচ্ছে ডি-কলোনাইজেশন বা বি-ঔপনিবেশিকরণ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণসমূহের ভেতরে এ ব্যাপারে ছোটো ছোটো ইঙ্গিত রয়েছে। কেবল কেরানি কিংবা আমলা পয়দা করার শিক্ষাব্যবস্থা তিনি চাননি। তার মানে উপনিবেশের সেবা করার জন্য কর্মী তৈরির উদ্দেশ্যে শিক্ষা কাজ করবে না, শুধু এটুকু নয়; বোধের ভেতর থেকে উপনিবেশ তাড়ানোর তাগিদটিও এর মাঝে রয়েছে। সারা পৃথিবীতে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে যাঁরা সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু তাঁদের পুরোধা। তিনি জানতেন উপনিবেশ কেবল রাষ্ট্রকাঠামো দখল করে না, মনোকাঠামোও কুক্ষিগত করতে চায়। চেতনা দখলের হাতিয়ার হিসেবে উপনিবেশ ভাষা

ও সাহিত্য দখল করে। এ দেশের মানুষের মনের ভেতরে জমে থাকা পাকিস্তান তিনি নানাভাবে তাড়াতে চেয়েছিলেন। সুতরাং বি-উপনিবেশিকরণের উপায় হিসেবে তিনি শিক্ষা মাধ্যমকে ব্যবহার করতে চাইবেন সেটাই স্বাভাবিক। শিক্ষা তাঁর কাছে উপনিবেশমুক্ত, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রকৌশল।

যথেষ্ট স্পষ্ট নয়, তবুও জ্ঞান-রাজনীতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। তিনি বলেছিলেন, 'শিখলেই শিক্ষিত হয় না, সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্ত হইতে হবে।' শেখা আর আলোকপ্রাপ্তি এই দুয়ের মাঝখানে জ্ঞান-রাজনীতির সংকেত লুকিয়ে আছে। শুধু শেখা জ্ঞান-অধীনতার কারণ হতে পারে। একটি দেশের সকল পরাধীনতার মূলে রয়েছে পরাগত জ্ঞানের অধীনতা। শিক্ষার মাধ্যমে সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্ত হলে মানুষ নিজের দেশের আবহমান জ্ঞানধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, নতুন জ্ঞান তৈরি করতে শেখে আর পরাগত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতায়ন ঘটায়।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনে গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাকে তিনি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে সংযোজন করেছিলেন। সবল-সুস্থ জাতিগঠনের জন্য তিনি স্বাস্থ্য শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মুক্তি-চিন্তার রূপায়ণ হিসেবেই জোর দিয়েছিলেন নারী শিক্ষার ওপর। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার বাস্তব উপযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার দুটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক। বিজ্ঞান শিক্ষা কেবল যে বস্তু জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে এমন নয়, বিজ্ঞান মানুষকে আধুনিক এবং অসাম্প্রদায়িক হতেও শিক্ষা দেয়। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের কায়িক পরিশ্রম না করার যে বাবুয়ানি তা দূর করতে চেয়েছিলেন। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে একটি যৌথতার বোধ তৈরি হয় এবং এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে জাতীয় জীবনে যৌথতা তৈরি করার ব্যাপারটি তাঁর কাম্য ছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে শিশু শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিয়ে সারা দেশে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবন-দর্শন, দেশ-ভাবনা কিংবা মানব-ভাবনারই অংশ। যে মূল্যবোধগুচ্ছকে তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে স্থাপন করেছিলেন শিক্ষার মাধ্যম বাহিত হয়ে সেগুলো যাতে শিক্ষার্থীদের চেতনা ও বিবেক গঠনে সহায়ক হয় সে ব্যাপারে তাঁর লক্ষ্য ছিল। নৈতিক শিক্ষা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাচিন্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কর্মজীবনে একজন ব্যক্তিকে সৎ ও চরিত্রবান হতে সহায়তা করে। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর মতো মহান মানুষের শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ এ দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য জ্ঞান-চর্চা আর জ্ঞান যোগাযোগের ক্ষেত্রে উৎসাহের অপরিমেয় উৎস হয়ে আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন দান করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাস রেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর তাদের বিবেকের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সত্যিকার অর্থে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর চিন্তার কোনো বিকল্প নেই।

তিন

শিক্ষা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসারিত পরিক্ষেত্র। প্রতীক, তথ্য, জ্ঞান, ভুবনদৃষ্টি, আত্মপরিচয়, দক্ষতা ও স্বপ্ন নির্মাণ এবং এসবের পরিবহণ ও পরিব্যাপনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা বাংলাদেশের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর সামাজিক রূপায়ব নির্মাণ ও রূপান্তরের নিয়ামক। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির শিক্ষাব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন কতটা প্রতিফলিত হলো তা সবসময়েই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি তৈরি এবং বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করা যায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শিক্ষা এ দেশের আত্মপরিচয়ের রাজনীতির অংশ হয়ে আছে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন আমলের মাত্র চব্বিশ বছরে মোট ছয়টি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় এবং আটটি শিক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা হয়। কিন্তু কোনোটিতেই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এ দেশে ক্রমাগত বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার রাজনীতি বেগবান হয়েছিল। এর সঙ্গে পাকিস্তানি আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব ছিল দৃশ্যমান। বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় ঘোষিত ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণের অঙ্গীকারটি যথাযথভাবেই তুলে ধরা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অভিঘাত এসে লেগেছে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ের ওপর। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত যুদ্ধের ক্ষেত্র।

বিশ্বায়নের ফলে জাতি রাষ্ট্রের ধারণাই হুমকির মুখে পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা বয়ে এনেছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার এই দেশে বৈশ্বিক জনশক্তি বাজার ধরার বিকল্প নেই এবং এক্ষেত্রে বিপুল প্রতিযোগিতা সামলাতে হয়। বাজার আর প্রতিযোগিতার এই

চাপের মুখে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে খানিকটা ছাড় দিতেই হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ থেকে যারা জনশক্তি আমদানি করতে চায় তাদেরও নিজস্ব কিছু চাহিদা থাকে। এসব কারণে শিক্ষার লক্ষ্য ও দর্শনে পরিবর্তন আসছে; অগ্রাধিকারের বিষয় বদলাচ্ছে।

একইভাবে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে গড়ে উঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের মতো করে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করছে। ধর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এমন কথা বলার সুযোগ কম। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশের শিক্ষা তথা জ্ঞান-রাজনীতি যথেষ্ট জটিল এবং এই জটিলতা অতিক্রম করে সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের আলোকে বাংলাদেশের আগামীর শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন করার কাজ খুবই কঠিন। তবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা মার্চ ২০১৮ ঢাকায় ওসমানী মিলনায়তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গবেষক এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান করেন– পিআইডি

আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে এ ব্যাপারে মনযোগী হয়েছে। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২), শামসুল হক শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭) এবং কবীর চৌধুরী শিক্ষা কমিশন (২০১০)– এর প্রতিবেদনসমূহ তার প্রমাণ।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে শিক্ষার দশটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছিল। এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রথম পাঁচটিতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার মানুষের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে যায়।

শামসুল হক শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির হয়েছিল চৌদ্দটি। এগুলোর ভেতরে কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুরণন যেমন ছিল তেমনি বিএনপি সরকার আমলের শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ছায়াও এসে পড়েছিল। বলা যায়, এই শিক্ষানীতিতে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ভাবাদর্শের একটি আপাত সমন্বয় ঘটেছিল। এটুকু বাদ দিলে উন্নত, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য এবং বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যেসব বোধ, চৈতন্য, দেশপ্রেম ও দক্ষতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন এই শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে সেগুলো ধরা পড়েছিল।

কবীর চৌধুরী শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ত্রিশটি। ভাষা ভিন্ন হলেও এই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যসমূহ মর্মার্থগত দিক দিয়ে কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লিখিত লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি ছিল। ২০১০ সালের শিক্ষা কাঠামোর প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে প্রায় পরিপূর্ণভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

২০১০ সালে শিক্ষানীতি ছাড়া বাংলাদেশে কোনো শিক্ষানীতিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ দীর্ঘ এই কুড়ি বছরে প্রধানত পাকিস্তান আমলের শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ১৯৭৫-পরবর্তী সামরিক সরকারে নির্দেশনায় পরিচালিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষার উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল।

চার

জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর খুনিচক্র বাংলাদেশের সংবিধান তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। ইতিহাসের এসব মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ দেশের গণমাধ্যম, শিল্প, সাহিত্য এবং বাচনিক সংস্কৃতিতে আমরা নতুন ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞার জন্ম হতে দেখেছি। কিন্তু খুনিচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থাকেও হত্যা করেছিল। বিস্ময়কর কিন্তু সত্যি, এ ব্যাপারে এ দেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত নীরবতা আছে। সাক্ষরতার হার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, শিক্ষার ব্যয় কমানো, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা আছে। কিন্তু ঘাতকচক্র কীভাবে সদ্য-স্বাধীন দেশের সমাজ রূপান্তর, সমৃদ্ধি আর গৌরবের আয়োজনমুখী শিক্ষানীতিকে ধ্বংস করেছিল সে সম্পর্কে কথাবার্তা নেই বললেই চলে। দীর্ঘ একুশ বছর পর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেছিলেন। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রত্যাবর্তনের শুরু তখন থেকেই।

খুব সতর্কতা আর চাতুর্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড পরবর্তী সরকার বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল অভিমুখ বদলে দিয়েছিল। জাতীয় আদর্শ, সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং এসব ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সংস্কার ও ক্রমপরিবর্তনের তাগিদ দেখিয়ে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি' গঠিত হয় (রেজিলিউশন নং সা-১/৫৬০ শিক্ষা, তরিখ ১১-১১-১৯৭৫)। গঠিত কমিটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরির যে নির্দেশনা তৈরি করেছিল আপাতদৃষ্টিতে তা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবের প্রতিফলন মনে হলেও অন্তর্গত চরিত্রে ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী।

বাংলাদেশের শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে পাঠ্যপুস্তক রচনার একটি সুচিন্তিত ধারণা কাঠামো এবং পর্যায়ক্রমিক করণীয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব ছিল টেক্সট বুক বোর্ডের ওপর; উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিএনপি আমলের পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবই থেকে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাসন দেওয়া হয়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়।

শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার বিবেচনায় নিয়ে শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করে। বিগত এক দশক ধরে সরকার পর্যায়ক্রমিকভাবে এসকল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। চারটি পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হয়েছিল। **প্রথমত** রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণের যে প্রস্তুতি আওয়ামী লীগ গ্রহণ করেছিল তারই ফসল এই শিক্ষানীতি। কুদরত-ই-খুদার শিক্ষানীতি ২০১০-এর শিক্ষানীতির লক্ষ্যগত পাটাতন নির্মাণে পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিল। **দ্বিতীয়ত** আওয়ামী লীগের দিন বদলের ইশতাহার, ভিশন–২০২১ এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প এই শিক্ষানীতির সামগ্রিক বাস্তবায়নের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিল। **তৃতীয়ত** শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়েছিল। **চতুর্থত** জাতিসংঘ শিশুর অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশু শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল।

২০১০ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতির দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

২০১০ সালে কবীর চৌধুরী কমিটির শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার পর পাঠ্যবইয়ের গুণগত পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকে উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা, সঠিক ইতিহাস এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বকাহিনি যথার্থ উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পাঠ্যপুস্তকসমূহে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন সম্পূর্ণ প্রতিভাসিত হচ্ছে একথা বলা যাবে না। পর্যাপ্ত গবেষণালব্ধ তথ্য হাতে নেই তবু সাধারণ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বলা যায়, পাঠ্যপুস্তক তৈরির পদ্ধতিগত জায়গায়, আধেয় ও অধ্যায় নির্বাচনে, মনোবৈজ্ঞানিক বিকাশ তত্ত্বের আলোকে এগুলো বিন্যাসে নতুনভাবে চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার নতুন রূপরেখার আলোকে পাঠ্যপুস্তক তৈরির জন্য অনেক বিষয় বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে আরও দুটি বিষয় বিবেচনায় আনা যেতে পারে। ১. শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্বে পুরোনো পাঠ্যবইয়ের প্রভাব এবং ২. ক্রমশ ঘনিয়ে আসা উত্তরাধুনিক আবহ।

বর্তমান পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবইয়ে বাঙালি আত্মপরিচয় নির্মাণের চেষ্টাটি যথেষ্ট বিস্তৃত এবং গভীর নয়। ইতিহাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপন না করলে এবং নৃতাত্ত্বিক শেকড় ঠিকভাবে না দেখালে শিশুমনে বাঙালির আত্মপরিচয় ঠিকভাবে ফুঠে উঠবে না। শিক্ষা কেবল চৈতন্য, মূল্যবোধ এবং দক্ষতা তৈরি করে না। শিক্ষা প্রবাহের ভেতরে যে দর্শন ও বিজ্ঞান থাকে তা চারপাশের বস্তুজগৎ ও ধারণা বিশ্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীর বিশ্বাসও তৈরি করে। শিক্ষার ভেতর দিয়ে বিশ্বাস তৈরি না হলে মানুষ উন্মুল হয়ে যায়, তার ভেতের নানা ভয় জন্মায়। ভীত মানুষ নিজের জন্য যেমন তেমনি সমাজের জন্যও ভয়ংকর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প এখন বাস্তব আয়তন ও গতি দুটোই অর্জন করেছে। তথ্য-সমাজ এবং জ্ঞান-সমাজ বর্তমানে আর দূর-শ্রুত কোনো শব্দযুগল নয়। বাংলাদেশের প্রাত্যহিক দৃশ্যমানতার অংশ। তথ্য-সমাজের জীবনের যে দুরন্ত গতিময়তা তাইতো উত্তরাধুনিক সমাজের বহির্লক্ষণ। বলা হচ্ছে বাংলাদেশ এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রাক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। শুধু প্রযুক্তির ঘনত্ব, সংযুক্তির ব্যাপ্তি কিংবা প্রস্তুত জ্ঞানের সহজলভ্যতাই নয়, উত্তরাধুনিক সমাজের আরও সব লক্ষণ বাংলাদেশে ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক গতি আর দৃশ্য সংস্কৃতিতে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন প্রযুক্তির প্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রযুক্তি প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়নের অংশ হয়েছে এবং প্রযুক্তির কারণেই তাদের কষ্ট আর দুঃখ জীবন-জয়ী সংগ্রামের নানা কাহিনি জনসমক্ষে হাজির হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থান, আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ, অন্য দেশে গিয়ে অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা শিক্ষার্থীদের শৈশবেই পাওয়া উচিত। মাল্টিমিডিয়েটেড বাস্তবতায় বহুমুখী সাক্ষরতা জরুরি হয়ে পড়েছে এবং বিষয়টিকে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিভুক্ত করার জন্য জরুরিভিত্তিতেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

উত্তরাধুনিক পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞরা বলেন, উত্তরাধুনিক শিক্ষা পরিবেশের জন্য রূপান্তরকামী পাঠ্যক্রম প্রয়োজন। রূপান্তরমুখী পাঠ্যক্রম ব্যক্তিক কাঠামো এবং জগৎকে দেখার চোখ বদলে দেয়। এই যে পাঠ্যক্রম তা শিক্ষার্থীর বুঝ তৈরি করে এবং তার রূপান্তরের পথচিত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

সাফল্য আর সম্ভাবনার সকল হিসাবনিকাশ মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন উচ্চতায় আবিষ্কার করছে। এ দেশের মর্মচেতনায় তিনি ক্রমাগত নতুন সময়ের আলোকবাহী। উন্নয়নযাত্রায় তাঁর সাফল্য আকাশচুম্বী। বর্তমান শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শেখ হাসিনা এ দেশের মানুষের চেতনা ও বিবেক মেরামতের কাজ করে চলেছেন। সমাজে এই শিক্ষাধারার মাধ্যমে রূপান্তরিত মানুষের স্বর শোনা যাবে আগামী চল্লিশের দশকে। তরুণ প্রজন্মের মাঝে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি যে মনোরম ভালোবাসা তৈরি হয়েছে তার মূলে রয়েছে শিক্ষায়তনের পাঠ্যবইয়ের প্রভাব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমুদ্র এবং আকাশে এ দেশের মানুষ তাদের বিজয়কে সম্প্রসারিত করেছে। তাঁর দূরদৃষ্টি আর অনমনীয় ভূমিকার কারণে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশে জাতির পিতার হত্যার বিচার হয়েছে, যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়েছে। তাঁর আলোকময় নেতৃত্বে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সত্যিকার অর্থেই যুগান্তকারী রূপান্তর সম্ভব হবে। ঘোষিত শিক্ষাব্যবস্থা রূপান্তরের নতুন রূপরেখা বেয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন আলো আসছে।

প্রফেসর ড. দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস: অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

মুজিববর্ষে বিশ্বনেতাদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা

নাসরীন জাহান লিপি

দীর্ঘকালের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ এক অবর্ণনীয় সত্তার অভিন্ন রূপ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়া বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আবার বাংলাদেশ নামের সবুজ- শ্যামল মাতৃভূমি পরম মমতায় গড়ে তুলেছিল শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর নেতা হয়ে ওঠাটা অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান নেতা আসলেই বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের আবেগ-ভালোবাসা-স্বপ্ন-চাহিদা-ক্ষোভ এবং সমস্যাগুলো জানতেন ও চিনতেন। তবে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব যেভাবে চিনেছে, শোষক ও শোষিতের পৃথিবী বলে তিনি যেভাবে চিনেছেন বিশ্বকে, তাতে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর দর্শন বিশ্বকে বদলে দেওয়ার জন্যও অপরিহার্য। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি মুক্তিকামী মানুষের নেতা। ষড়যন্ত্রকারীদের ঘাতকের বুলেটে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নটা তাই অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। তবে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে আরেকটি স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ ও দেশবাসী। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের রূপায়ণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ পৃথিবীতে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার রোল মডেল। ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণসহ বৈদেশিক বাণিজ্য, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়নের সূচকে অসাধারণ অগ্রগতির উদাহরণ। এর সাক্ষ্য দিয়েছেন জাতিসংঘ-ওআইসি'র মহাসচিব, যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার প্রেসিডেন্টসহ বিশ্বনেতারা। সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ যে বিশ্বের উন্নয়নে রোল মডেল হয়েছে, 'মুজিব চিরন্তন' প্রতিপাদ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনে ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় উপস্থিত থেকে প্রদত্ত বক্তৃতা ও প্রেরিত ভিডিও বার্তায় বিশ্বনেতাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেশবাসীকে গর্বিত করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষের উদ্‌বোধনকালে বিশ্বনেতাদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা

২০২০ সালের ১৫ই জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৭ই মার্চ ২০২০-২৬শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়কে 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ মুজিববর্ষে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানোর সুযোগ পেয়েছে। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে নির্মিত স্টেজে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সহায়তায় ধারণকৃত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান 'মুক্তির মহানায়ক' ১৭ই মার্চ ২০২০ তারিখ রাত ৮টায় সকল টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন ও সামাজিক মাধ্যমে একযোগে সম্প্রচারিত হয়। উপভোগ করেন সারা বিশ্বের কোটি দর্শক। এই অনুষ্ঠানে ভিডিও'র মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারী, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং ওআইসি'র মহাসচিব ড. ইউসুফ আহমেদ আল-ওথাইমিন। তাঁদের বক্তব্যেও উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা।

নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভূষিত করেছেন 'An able daughter of Father of the Nation and a successful leader, Government and the People of Bangladesh' হিসেবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করতে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টা, বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে সম্ভব করে তোলায় বাংলাদেশ এখন উদাহরণ হিসেবে বিশ্বের কাছে প্রতীয়মান, তিনি তাঁর ভাষণে সুস্পষ্টভাবে এর উল্লেখ করেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ভিডিও শুভেচ্ছা বার্তায় মুগ্ধতা মেশানো কণ্ঠে বলেছিলেন, "আজ আমার খুব ভালো লাগে, যখন দেখি যে বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে দিনরাত নিজেদের প্রিয় দেশকে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে কাজ করে চলেছেন।" বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'বন্ধুগণ, বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় এবং শেখ হাসিনাজির নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং উন্নয়নভিত্তিক নীতিগুলো অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অর্থনীতি থেকে শুরু করে অন্যান্য সামাজিক সূচক কিংবা ক্রীড়াক্ষেত্রে দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ক্ষমতায়ন, মাইক্রো ফাইন্যান্স এরকম অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে।'

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং-এর বার্তায়ও মুগ্ধতা ছিল। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, 'Bangladesh has achieved unprecedented success under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.' আজ যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর অর্জনের ধারাবাহিকতা দেখলে খুশি হতেন, কেননা এই অর্জন সম্ভব হয়েছে 'his passionate daughter'-এর মাধ্যমে– এই ভাবনা লোটে শেরিং-এর। বাংলাদেশের এই অগ্রগতি চলমান থাকবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি ভবিষ্যতেও বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ওআইসি'র মহাসচিব ড. ইউসুফ আহমেদ আল-ওথাইমিন ১৯৭৪ সালের ওআইসি সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সোনার বাংলা গড়ার জন্য বাবার স্বপ্নকে অনুধাবন করে কন্যা শেখ হাসিনা বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনে সংগ্রাম করছেন জানিয়ে বর্তমানের বাংলাদেশকে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তির উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেন।

'মুজিব চিরন্তন' প্রতিপাদ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্‌বোধন উপলক্ষে ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় প্রদত্ত বিশ্বনেতাদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনন্য মুহূর্ত উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির নির্দেশনায় জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ঢাকাস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সীমিত জনসমাগমে আয়োজন করে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো অনুষ্ঠান– ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত দশ দিনব্যাপী 'মুজিব চিরন্তন' শীর্ষক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা। অনুষ্ঠানে প্রতিদিন একটি করে থিম ছিল, থিমভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম এবং বাঙালির আবহমান সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন দেশ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আমাদের উপহার দিয়েছে। চীনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য উপহার দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানমালার বিভিন্ন দিনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী আর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আগত বিদেশি অতিথিরা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলোর পাঁচ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যে প্রথমে সীমিত আকারেই অনুষ্ঠানের ভাবনা ছিল। কিন্তু সারা পৃথিবী থেকে বিশ্বনেতাদের বিপুল আগ্রহে অনুষ্ঠানটা এক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে অনুষ্ঠানস্থল জাতীয় প্যারেড স্কয়ার পরিণত হয় দক্ষিণ এশিয়ার মিলনকেন্দ্রে। এছাড়াও এই আয়োজনে ভার্চুয়ালি মুজিব চিরন্তনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। দিয়েছেন ভিডিও বার্তা। পাঠিয়েছেন লিখিত শুভেচ্ছা বাণী। এসব বক্তব্য ও বার্তায় বিশ্বনেতারা প্রত্যেকে যেভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অসামান্য অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, এটা 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে বাংলাদেশ ও দেশবাসীর জন্য গৌরবময় অর্জন। নেতাদের বক্তব্যে শেখ হাসিনার সরকারের এই সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সফলতার প্রশংসা উঠে আসে। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে শেখ হাসিনা আশ্রয় দিয়ে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলেও বিশ্বনেতারা মন্তব্য করেন। বৈশ্বিক সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপেরও তাঁরা প্রশংসা করেন।

বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের আগমনের সংবাদ ও তাঁদের বক্তব্যের প্রতি জনগণের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বের সঙ্গে এসব প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে দেশি ও বিদেশি সংবাদমাধ্যম ও টেলিভিশন চ্যানেলে। অনলাইন মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও জনমানুষের আগ্রহের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এর ফলে 'মুজিব চিরন্তন' একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। ভারত, ভুটান, শ্রীলংকা, নেপাল, চীনের নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। দেশের তৃণমূলের মানুষ, প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিদেশিরা টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের নানাদিক সম্বন্ধে বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে নানা তথ্য, ডিজিটাল কনটেন্ট। একইসঙ্গে বিশ্ববাসী জেনেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংগ্রাম, বাংলাদেশের অগ্রগতিতে তাঁর অসামান্য অবদান।

সশরীরে উপস্থিত থাকা বিশ্বনেতাদের বক্তব্য

প্রথম দিনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ, তৃতীয় দিনে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে, ষষ্ঠ দিনে নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারী, অষ্টম দিনে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং এবং দশম ও শেষ দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ

মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে দ্রুত বর্ধমান ও শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় অগ্রগতির কারণ হিসেবে বাংলাদেশ যে যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা চালিত হচ্ছে, তার উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানান বর্তমান সরকারের কাছ থেকে পাওয়া নানা সহযোগিতার জন্য। কোভিড-১৯ মহামারিতে বাংলাদেশ নিজেও যুদ্ধ করছে। এর মধ্যেও মালদ্বীপে খাবার, সুরক্ষা সামগ্রী, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং চিকিৎসক দল পাঠিয়েছে জানিয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘটে যাওয়া বিশ্বের সবচেয়ে জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কারণে বাঙালি জাতি জাতীয় বীরকে, স্বাধীনতার স্থপতিকে হারিয়েছে। একইসঙ্গে বাবার ভালোবাসার কন্যা হারিয়েছেন বাবা-মা ও প্রিয় অনুজদের। এরপরও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা শোক থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বাংলাদেশকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গ এনেছেন শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে। তিনি ঠিক এভাবে বলেছেন, 'Madam Prime Minister, despite setbacks, Bangladesh continues to flourish under your able leadership. That is the best honor in the name of your esteemed father.'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গোপসাগর এলাকাতে 'নীল অর্থনীতি' গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব করেছেন। সমুদ্রের বিশাল সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য তাঁর প্রস্তাবকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন কৃষিতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের কথা। শ্রীলংকার মনোযোগ কেড়েছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নের কৌশল।

নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারী

নেপালের রাষ্ট্রপতি হিসেবে এটাই বিদ্যা দেবী ভান্ডারীর প্রথম আসা বাংলাদেশে। ব্যক্তিগতভাবে আগেও এসেছেন বলে এবারের ভ্রমণে চোখে পড়েছে বদলে যাওয়া বাংলাদেশকে। সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে এভাবেই বাংলাদেশের উন্নয়নকে তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি জানান, বিপুল জনসংখ্যার বাংলাদেশ সাফল্যের সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন করেছে, মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। তাঁর কথায়, 'I feel happy to witness these positive changes taking place in our friendly country and the life of its people.'

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে নেপালের রাষ্ট্রপতি তাঁকে কেবল বঙ্গবন্ধুর সার্থক কন্যা নয়, সোনার বাংলার অনুপ্রেরণা অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে তাঁকে এই অঞ্চলের দক্ষ নারী নেত্রী হিসেবেও স্বীকৃতি দেন।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং

বাংলাদেশে চিকিৎসাবিদ্যায় পড়তে এসে চমৎকার বাংলা শিখে ফেলা ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং-এর বক্তব্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আবেগ স্পষ্ট ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনুপ্রেরণাদায়ী নেতা, মাতৃসম ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। কোভিড-১৯ মহামারিতে বিশ্বের আর সব দেশের মতো ভুটানও যুদ্ধ করছে। যুদ্ধ করছে বাংলাদেশও। এরকম সময়েও ভার্চুয়াল আলাপের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে লোটে শেরিংকে সাহস জুগিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। লোটে শেরিং তাঁর বক্তব্যে বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, তিনি বুঝতে পারেন বাংলাদেশের জনগণের জন্য শেখ হাসিনার মমতার গভীরতা কতখানি। তাঁর ভাষায়– 'She is one such leader who places freedom and happiness of her people before everything.'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো নেতৃত্ব পেয়ে বাংলাদেশ সত্যিকারভাবে ভাগ্যবান। লোটে শেরিং বলেন, তিনি নিশ্চিত যে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে নিয়ে গর্বিত, গর্বিত তাঁর কন্যাকে নিয়েও। বিপুল জনসংখ্যার বাংলাদেশকে মহামারির সময়ে দক্ষ হাতে রক্ষা করছেন শেখ হাসিনা, সে কথা উল্লেখ করে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। এর প্রমাণ– মহামারি সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে সর্বোচ্চ জিডিপি বাংলাদেশের।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

দশম দিনে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর সমাপনী দিনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হিন্দির পাশাপাশি বাংলায়ও কথা বলেন তিনি, বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য গানের কথা বাংলায় উচ্চারণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে হিন্দিতে বলেন, যার বাংলা অনুবাদ এরকম– 'আমি আনন্দিত যে, শেখ হাসিনাজির নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে তার সক্ষমতা প্রদর্শন করছে। যারা বাংলাদেশ গঠনে আপত্তি করছিলেন, যারা এখানকার মানুষকে নিচু চোখে দেখতেন, যারা বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিলেন, বাংলাদেশ তাদের ভুল প্রমাণ করছে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও সংস্থাপ্রধান ভার্চুয়ালি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন

বিশ্বনেতাদের পাঠানো ভিডিও ও লিখিত শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সশরীরে উপস্থিত পাঁচটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের শুভেচ্ছা বক্তব্যসহ সারা বিশ্ব থেকে সর্বমোট ২১৭টি শুভেচ্ছা বার্তা পাওয়া যায়। এর মাঝে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ১২৬টি দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে লিখিত বার্তা এসেছে। ১৩টি লিখিত বার্তা এসেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে। ভিডিও'র মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা আসে সর্বমোট ৪৫টি, ৩৩টি এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে এবং বাকি ১২টি এসেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সমাপনী দিনে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

থেকে। আরও ২৭টি বার্তা এসেছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে।

জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত দশ দিনের আয়োজনে সময় স্বল্পতার কারণে এই বিশ্বনেতাদের ১৭টি ভিডিও বার্তা বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়– চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইউশিহিদে সুগা, বিশিষ্ট সাংবাদিক স্যার মার্ক টালি, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ভি. লাভরফ, ওআইসি'র মহাসচিব ড. ইউসুফ আহমেদ আল-ওথাইমিন, ফ্রান্সের সিনেটর ও ইন্টার পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ ফর সাউথ-ইস্ট এশিয়া'র প্রেসিডেন্ট মাদাম জেকোলিন ডেরোমেডি, জর্ডানের মহামান্য বাদশার পক্ষে ঐ দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি, ইউনেসকো মহাপরিচালক অড্রে আজুলে, ভ্যাটিক্যান সিটির পোপ ফ্রান্সিস, ভারতের রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধী, ব্রিটিশ ওয়েলস-এর প্রিন্স চার্লস, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চাং সে কাইয়ুন, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ জাপানের তাকাশি হায়াকাওয়া-এর পুত্র ওসামু হায়াকাওয়া, ফিলিপিনস-এর সেক্রেটারি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স টুডেরো এল. লকসিন জুনিয়র।

সময়ের অভাবে লিখিত শুভেচ্ছা বার্তার সবগুলো পাঠ করা সম্ভব হয়নি। অনুষ্ঠানে মোট ১৫টি লিখিত বার্তা পাঠ করা হয়। এগুলো হলো– জার্মানির রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্ক-ভাল্টার স্টাইনমায়ার, ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ, স্পেনের রাজা কিং পঞ্চম ফিলিপ, বেলজিয়ামের রাজা ফিলিপ, চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি মিলোস জেমান, পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেই দুদা, জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট এডগার চাগওয়া লুঙ্গু, কিউবা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল ডাজ-ক্যানেল, বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী বয়কো বোরিসোভ, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তায়িপ এরদোয়ান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জুনিয়র এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পাঠানো লিখিত শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করা হয়।

স্থান সংকুলান হবে না বিধায় এই নিবন্ধে সবার বক্তব্য তুলে আনা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসার পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্জনকে সম্মান জানানোর বিষয়ে পাঠকের গৌরবময় অনুভবের সুবিধার্থে কিছু চুম্বকাংশ দেওয়া হলো মাত্র।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ভিডিও বার্তায় যেমনটি বলেছেন, পঞ্চাশ বছর আগে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ উন্নয়ন ধরে রেখে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও অবদান রেখে চলেছে। নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকেও বাংলাদেশ বেরিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনার অংশগ্রহণ, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামে অংশীদারিত্ব এবং মিয়ানমার থেকে আসা লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্ব সমাজে অবদান রেখে চলেছে বাংলাদেশ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভিডিও বার্তায় বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দারুণ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হয়েছে এবং দ্রুত বর্ধনশীল বিশ্বের কাতারে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। ৬ শতাংশের অধিক জিডিপি'র (মোট দেশজ উৎপাদন) মাধ্যমে বাংলাদেশ তার দেশের মানুষের জীবনকে উন্নত করছে এবং বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। চীনের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জীবনমান উন্নয়ন, বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা উল্লেখ করে কোভিড-১৯ প্রতিরোধসহ উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

শুভেচ্ছা ভিডিও বার্তায় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইউশিহিদে সুগা বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাপান শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে জাপান বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানান তিনি।

তবে বাংলাদেশ এখন কেবল অন্য দেশের সাহায্য-সহযোগিতা নেয় না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্য দেশকে সাহায্য-সহযোগিতাও দিচ্ছে। দশ বছর আগে জাপানে ভূমিকম্প আঘাত হানার পর বাংলাদেশ মানবিক সাহায্য পাঠিয়েছিল, তার জন্য ধন্যবাদ দেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর ভিশন বাস্তবে পরিণত হয়েছে বলে ভিডিও বার্তায় মন্তব্য করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। জাস্টিন ট্রুডো বলেন, এই বাংলাদেশ এক অন্য বাংলাদেশ। শৈশবে বাবার সঙ্গে এসে যে বাংলাদেশ তিনি দেখেছিলেন, সেই দেশের ৫০ বছর পূর্তিতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বদলে যাওয়ার চিত্রই ধরা পড়ছে তাঁর চোখে। এখন বাংলাদেশে অনেক উন্নয়ন ঘটেছে, দারিদ্র্য কমেছে বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জুনিয়র। বাংলাদেশকে অপার সম্ভাবনা ও সুযোগ হিসেবেও অভিহিত করেন তিনি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে পাঠানো এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি আপনাকে ও বাংলাদেশের জনগণকে এই অভূতপূর্ব অর্জনের জন্য অভিনন্দন জানাই। বাইডেন তাঁর অভিনন্দন বার্তায় শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে বলেন, আপনি ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এটি বিশ্বে উদারতা ও মানবতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি বাংলাদেশের আরও অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

বিশ্বের অন্যতম বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ায় বাংলাদেশের প্রশংসা করে ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স চার্লস বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাফল্য উল্লেখ করার মতো। তাঁর ভাষায়– 'In this regard, I particularly welcome the role of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina in charing the Climate Vulnerable Forum of nations most affected by the multiple threats of global warming, climate change and biodiversity loss.'

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। আমরা বাংলাদেশের সমৃদ্ধির স্বপ্নের সঙ্গে থাকতে চাই। বাংলাদেশের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, আপনাদের দেশ অগ্রগতি ও ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে স্থিরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মর্যাদা অর্জন করেছে।

ভিডিও বার্তায় জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ার বলেন, উদ্ভাবনী উন্নয়ন নীতি ও কৌশল গ্রহণ করে বাংলাদেশ স্পষ্টভাবে দারিদ্র্য হ্রাসে সফল হয়েছে।

শুভেচ্ছা বার্তায় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেন, বাংলাদেশে ভিন্ন ঐতিহ্য ও সম্প্রদায়ের মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করছে। এমন বহুত্ববাদী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রজ্ঞার ফসল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও রাজনৈতিক জীবন দেশটির প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত। পাশাপাশি এটা বিগত সময়ের সংলাপ ও বৈচিত্র্যের চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন বলেন, রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বাংলাদেশ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জন এবং দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করেছে। ২০২১ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা পূরণে বাংলাদেশ সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রশংসা করে জর্ডানের বাদশা আব্দুল্লাহ বলেন, গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। যার মাধ্যমে দেশের জনগণের সহনশীলতা ও নেতৃত্বের প্রজ্ঞা প্রতিফলিত হয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী, শান্তি বজায় রাখা, আরও উন্নয়ন এবং জনগণের সক্ষমতা কাজে লাগানোর মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও বেশি অগ্রগতি অর্জন করবে বাংলাদেশ।

যে পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, সেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশের জনগণের শান্তি-অগ্রগতি-সমৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের প্রতি অন্য দেশগুলোর বন্ধুত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক বড়ো উদাহরণ হয়ে থাকবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানমালা। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী একই সময়ে হওয়ায় উৎসবে এসেছে ভিন্ন মাত্রা। অনুষ্ঠানের মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত হলো স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। বর্তমান বিশ্ব বাংলাদেশকে কীভাবে মূল্যায়ন করছে, এর প্রকাশ দেখা গেছে এই উৎসবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবে কীভাবে বিশ্বনেতৃবৃন্দ সম্মানিত করেছেন, তা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নাসরীন জাহান লিপি: প্রধান মিডিয়া কর্মকর্তা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেলেন ২১ জন বীরাঙ্গনা

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের হাতে নির্যাতিত আরও ২১ জন বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেলেন। এ বীরাঙ্গনাদের বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে ২৪শে আগস্ট গেজেট জারি করেছে সরকার। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) ৭৫তম সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীরাঙ্গনারা এ স্বীকৃতি পেলেন। এ নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া বীরাঙ্গনার সংখ্যা ৪৩৮ জনে দাঁড়াল।

নাটোরের হাফিজা বেগম, মোছা. কমেলা, নাছিমা বেগম, মোছা. আকলিমা বেগম, সাহেরা, মোছা. শরীফা ইসলাম, মোছা. ফিরোজা বেগম. মোছা. আয়েশা বেগম, মোছা. ফাতেমা, মোছা. জোসনা বেগম, মোসা. আছমা বেগম, মোছা. রেজিয়া বেগম ও মোছা. আমবিয়া বেগম মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেয়েছেন। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেয়েছেন– বরিশালের রোকেয়া বেগম ও বিভা রানী মজুমদার, খুলনার সন্ধ্যা রানী বিশ্বাস ও অঞ্জনা বালা বিশ্বাস, পাবনার মোছা. আনোয়ারা বেগম ও মোছা. বিলকিস বানু, কুমিল্লার মোসা. তাহেরা বেগম এবং নওগাঁর বদরুন নেছা।

এ স্বীকৃতির কারণে তাঁরা মাসিক মুক্তিযোদ্ধার ভাতাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া সমস্ত সরকারি সুবিধা পাবেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত নারীদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেন। তাঁর অধীনে এসব নারীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়। তবে, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার পর এ কাজ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে, ২০১৪ সালের ২৭শে জানুয়ারি হাইকোর্টের একটি আদেশের পর বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১০ই অক্টোবর বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল। পরের বছরের ২৯শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে ওই প্রস্তাব পাস হয়।

প্রতিবেদন : কুমার দেব

প্রধানমন্ত্রীর কফি

ফরিদুর রেজা সাগর

এখন ঢাকা শহরে প্রচুর কফি হাউস। কফির সব দোকান বলা যায় রাস্তা আর পাড়ার মোড়ে মোড়ে। একটা সময় এ দৃশ্য ছিল বিরল।

কফির দোকান দূরের কথা, কফির সাধারণ যে ছোটো-বড়ো কৌটা সেটাও কিনতে পাওয়া যেত না। নানা দোকানে খুঁজে খুঁজে গলদ্‌ঘর্ম হতে হতো। পেতে হলে আনতে হতো বিদেশ কিংবা এয়ারপোর্টের দোকান থেকে।

বিদেশ থেকে ফেরার পথে কফির বোতল নিয়ে আসতে হতো। ঢাকার অভিজাত পাড়ার এক-দুটি দোকানে মাঝেমধ্যে উঁকি দিত কফির বোতল।

যে সমস্ত দোকানে কফি পাওয়া যেত, পরবর্তীতে দেখা গেছে সেইসব হয় মুখে নেওয়া যেত না অথবা বড়ো যেনতেন কাপে পরিবেশন করা সেসব কফি খুবই সাধারণ মানের। শুধু পানিতে গোলানো বেহিসাবি দুধ মেশানো সেই কফির দাম থাকত সুস্বাদু চায়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

তেমন একটা সময়কালে আমাদের বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে 'পিঠাঘর' দোকানটি ব্যবসায় রমরমা। নানা কিছু সেখানে বিক্রি আর পরিবেশন করা হয়। খিচুড়ি, বড়ো মাছ, বিরিয়ানি, ছোটো মাছ, সাদা ভাত, ভর্তা, ভাজি, পিঠা, জিলাপি আর মুখরোচক সব খাবার খেতে ভিড় জমতো ক্রেতা সাধারণের। তবে কফি বিক্রিবাট্টার গতি ততখানি জমজমাট ছিল না।

পিঠাঘর-এ আমি আর শাইখ সিরাজ নিয়মিত থাকি। বিটিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান তৈরি করি। আর অনুষ্ঠান তৈরির ফাঁকে পুরোটা সময় সকাল আটটা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পিঠাঘর-এ সব দেখভাল করতে করতেই সময় পেরিয়ে যায়। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে শুধুই পিঠাঘর। যার আরেক নাম দেওয়া হয়েছিল 'খাবারদাবার'।

পিঠাঘর-এর কয়েক দালান পর আওয়ামী লীগের অফিস। নেতা-নেত্রী আর নিবেদিত কর্মীবাহিনীর দিবারাত্রি আসা-যাওয়া। সেই আসা-যাওয়ায় স্বভাবতই আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। সেই কার্যালয়ে স্বাভাবিক কারণে প্রায়শই আসতে হতো তাঁকে। বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে আসতেন তিনি।

নানারকম দিক নির্দেশনা, বৈঠক আর আলোচনার টেবিলে তাঁকে থাকতে হতো। সামনের দিনগুলোতে আওয়ামী লীগের কর্ম পরিকল্পনা তাঁর দূরদর্শী চিন্তায় এগিয়ে যেত। তাঁর দিক নির্দেশনায় দলীয় কর্মী ও নেতারা চলতেন। আমরা পিঠাঘর থেকে তার উত্তাপ উপলব্ধি করতাম।

সেই সময়ের সভানেত্রী তাঁর মিটিং রুমে এসে নিশ্চয়ই বলতেন তাঁর কাছের মানুষদের কাছে একথাটা। কফি প্রধানমন্ত্রীর তখন খুব প্রিয় ছিল। তাই টেবিলে বসেই তাঁর কাছের মানুষদের মিষ্টি হেসে বলতেন,

'আমার কফি কোথায়?'

দ্রুত সেই কফির আয়োজন করাটা আসলে তখন নেতাকর্মীদের জন্য যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়তো।

আমি ধরে নিচ্ছি, তারপরও তারা নিশ্চয়ই নানাভাবে সভানেত্রীর জন্য কফির ব্যবস্থা করতেন।

যতটুকু জানি, সেই জানার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমাদের নেত্রী খুব সাধারণ খাবার খেতে পছন্দ করেন। সাধারণ আইটেমের খাবারেই তাঁর অভ্যস্ততা। তাঁর একটি বড়ো গুণ, তিনি যখন কিছু খেতে বসেন, বিস্কুট কী খেজুর, সামনে থাকা ব্যক্তিকেও অফার করতেন খেতে।

তাই অনুমান করতেই পারি, সেই কফির সঙ্গে একটু সিঙারা, একটু সমুসা এ ধরনের খাবার সেসময় খেতে চাইতেন। কখনো কিছু একলা না খাওয়ার স্বভাবের মানুষ প্রধানমন্ত্রী আমি জানি, সেই কফি-সিঙারা খাওয়ার সময় নিশ্চয়ই অন্যরাও শেয়ার করত।

তো সেই সময়ে হঠাৎ একদিন আমাদের আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা প্রয়াত আবদুল জলিল সাহেব এসে উপস্থিত পিঠাঘর-এ।

যেহেতু আমাদের দোকানটি আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের অতি কাছে, সেহেতু তিনি হাজির হলেন আমাদের দোকানে। তখন এলাকার মধ্যবিত্ত মানের অভিজাত রেস্তোরাঁ আমাদের খাবারদাবার। খাবারদাবারে সমুসা, পিঠা, সিঙারা, চা এবং কখনো কফি আশপাশের সবার মনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলেছিল। তৈরি করেছিল আলাদা ইমেজও। খাবারদাবারের দোতলায় যে অংশটা ছিল, সেই কর্নারে প্রায়ই আমরা দেখতাম, আওয়ামী লীগের নানা পর্যায়ের নেতারা ও অ্যাকটিভ কর্মীরা বসে কথা বলছেন। চা-সিঙারা খাচ্ছেন। আর আলোচনায় মত্ত থাকছেন। প্রায় দিনভর সময় কাটাচ্ছেন।

তো আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা আবদুল জলিল সাহেব একদিন এলেন। আমি তাঁকে প্রথমে খেয়াল করতে পারিনি কাজের ব্যস্ততায়।

আমাকে ডেকে বললেন, 'শোনেন, আপনি তো সারাক্ষণ দোকানে থাকেন। তাই না?'

বললাম, 'জ্বি। আমিও থাকি, মাটি ও মানুষ-এর শাইখ সিরাজও থাকেন।'

বললেন, 'হ্যাঁ। দুজনকেই আমরা টেলিভিশনে দেখেছি। এখন আপনাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই।'

সবিনয়ে হেসে বললাম, 'জ্বি বলুন।'

জলিল সাহেব হাসলেন, 'আমি একটা আনকোরা কফির বোতল এনে আপনাকে দিতে চাই।'

কথাটা শুনে অবাক চোখে তাকিয়ে আছি। বুঝতে পারছিলাম না তখনো বিষয়টি।

তিনি বললেন, 'এ কফির বোতলটি একটু কষ্ট করে আলাদা রেখে দেবেন।'

মাথা দোলালাম, 'হুম। তারপর?'

'আমাদের নেত্রী যখন আসবেন আমাদের দপ্তরে, তখন আমি কাউকে পাঠাবো আপনাদের কাছে।'

আমি তাকিয়ে আছি জলিল সাহেবের চোখে।

তিনি বললেন, 'আমার পাঠানো লোক আসার পর আপনার কাছ থেকে সুন্দর করে বানানো কফিটা নিয়ে যাবেন।'

মাথা নাড়ালাম, 'অবশ্যই। এটা কোনো কঠিন কাজ নয়। কোনো সমস্যা হবে না।'

জলিল সাহেব বার বার করে বলতে থাকলেন, 'দেখুন এটা আমাদের সভানেত্রীর কফি। বোতলটা খুব সাবধানে রাখতে হবে।

রাখতে হবে যত্ন করে। এবং যখনই আমার মানুষ আসবেন, শত ব্যস্ত হলেও তখনই আপনাকে কফিটা যত্ন করে তৈরি করে দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'এটা নেত্রীর জিনিস। কোনো চিন্তা করবেন না। উনি তো আমাদেরও নেত্রী। তাই এ দায়িত্ব ঠিকঠাক মতো পালন করতে পারলে আমরা খুশি হবো।'

সেই শুরু হলো। একের পর এক কফির বোতল শেষ হতেই আরেকটা আসে।

আজ এত বছর পর মনে হয় যে, আমাদের খাবারদাবার-এর দোকান পিঠাঘর থেকে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের যে দূরত্ব, সে দূরত্ব খুব বেশি না হলেও, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেই স্পেশাল কফি তৈরি করে আমাদেরকে পাঠাতে হতো। যত্ন আর ভালোবাসার কোনো ব্যত্যয় ঘটত না। খামতি ঘটত না। বরং থাকত আনন্দময় কর্মকাণ্ডের ছোঁয়া।

শাইখ সিরাজ জলিল সাহেবের সেই প্রেরণ করা বোতলটি যথেষ্ট যত্নসহকারে, একেবারে আমাদের টাকাপয়সা রাখার যে গুরুত্বপূর্ণ আলমারি, সেখানে নিয়ে রেখে দিতেন। যেন এক যক্ষের ধন ছিল তা! যক্ষের ধনের মতো বোতলটা রাখা হতো।

কফি নিতে আসতেন নির্দিষ্ট মানুষ। দায়িত্ববান মানুষ। তার মধ্যে ছিলেন খ্যাতিমান তরুণ সাংবাদিক আবুল কালাম আজাদ। এখন আছেন *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা*'র প্রধান পুরুষ হিসেবে। তখন ছিলেন দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর উজ্জ্বলতম প্রতিবেদকের দায়িত্বে। মাঝে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব।

জলিল ভাইয়ের প্রতিনিধি হয়ে বেশির ভাগ সময়ে আবুল কালাম আজাদ আসতেন আমাদের খাবারদাবার-এ। আসার আগে কখনো কখনো খবর পাঠানো হতো।

আজাদ সাহেব হাজির হওয়া মাত্রই গরম কফির মগ রেডি হয়ে যেত। কখনোবা তিনি আসার পরে তাঁর সামনে কফির মগ তপ্ত পানিতে ধুয়ে কফি তৈরি হতো।

আমাদের একজন কর্মচারী ছিল, খুব সুন্দর কফি বানাতো। শাইখ সিরাজ নিজেও পারঙ্গম ছিলেন ভালো কফি তৈরিতে।

যথেষ্ট যত্নসহকারে সাদা টিস্যু পেপারে ঢেকে সেই কফির মগ নিয়ে যাওয়া হতো সভানেত্রী শেখ হাসিনার ঘরে। সেটি ছিল এক দেখার মতো দৃশ্য!

আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে, আহা, এ সমস্ত দৃশ্য আর ঘটনা যদি স্মৃতিতে রাখার পাশাপাশি ধরে রাখা যেত ক্যামেরায়!

আমরা যারা টেলিভিশনে কাজ করি, যাদের সঙ্গে চিত্রগ্রহণের বসবাস, তারা কেন যে বিবেচনাপ্রসূত হয়ে এসব ঘটনা ধারণ করি না, যা পরে হয়ে যেতে পারে ইতিহাসের অংশ!

এখনো অনেক কিছু ঘটে, যা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা ক্যামেরায় ধরে রাখি না বা ধরতে পারি না যা আগামী প্রজন্মের জন্য হতে পারে অহংকারের ছবি।

শুধু মুখে মুখে কিংবা লিখে লিখে ইতিহাস স্পষ্ট রাখা অনেকই কঠিন। নিশ্চয়ই এমন অনেক ছোটো ছোটো ঘটনা রয়েছে, যে ঘটনাগুলো আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ইমেজকে এক অসামান্য মানুষের অবয়ব দেবে। যদিও আমরা অসামান্য মানুষের রূপ দেখে থাকি তাঁর আমাদের দেখা বৃহত্তর সব ঘটনায়!

প্রধানমন্ত্রী আপনাকে জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা।

ফরিদুর রেজা সাগর: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

শেখ হাসিনা: নদী রক্ষায় আন্তরিক প্রধানমন্ত্রী

প্রফেসর ড. তুহিন ওয়াদুদ

ব্রিটিশ শাসনামল থেকে নদীর সর্বনাশ শুরু হয়েছে। সেই সর্বনাশ ক্রমশ বেড়েছে। সময় যতই গড়াচ্ছে আমাদের দেশের নদীগুলোর প্রতি ততই যেন অবিচার করা হচ্ছে। অথচ এই নদীগুলোই আমাদের ভূমি তথা জনপদের প্রাণশক্তি। আমাদের ভূমি নদীবিধৌত। আমাদের সংস্কৃতি নদী প্রভাবিত। আমাদের মন ও মননরেখার বিনির্মাণও নদী সিঞ্চিত। অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নদীর সঙ্গে আমাদের জীবনের। অকাট্য যুক্তিতে তা নিরূপণকৃত। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পথচলার সঙ্গে নদী জড়িত। আমাদের সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক। দেশে যত এলাকার নামের সঙ্গে গঞ্জ যুক্ত আছে সবগুলোই কোনো না কোনো নদীর পাড়েই গড়ে উঠেছে। জীবনের পরতে পরতে নদী মিলেমিশে একাকার।

নদী সম্পর্কে তথা নদীর সঙ্গে জীবনের গভীর সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের জ্ঞানজগৎ খুবই সংকুচিত। ফলে আমাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত নয়। যদি আমরা নদীর সঙ্গে আমাদের অতীতমুখী ও ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্কের কথা অনুধাবন করতে পারতাম, তাহলে নদীর প্রতি আমাদের ঘুমন্ত দায়িত্ববোধ জেগে উঠত। অথচ নদীর সর্বনাশ মানে আমাদের নিজেদের সর্বনাশ। দুঃখজনক হলেও সত্য, এখন পর্যন্ত আমরা এই সত্যকে অনুধাবন করতে পারিনি। তাই নদীর প্রতি আমরা কী অবিচার-ই না করছি!

সময় যায়, কিন্তু নদীর ভাগ্যের কোনো উন্নয়ন হয় না। মহামান্য হাইকোর্ট নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করেছে। আক্ষরিক অর্থেও নদী জীবন্ত সত্তা। শুধু তাই নয় নদী হলো জলদুগ্ধবতী। নদীর জলদুগ্ধে আমরা প্রতিপালিত। নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণার মধ্য দিয়ে নদীর মর্যাদা এবং বেঁচে থাকার আইনি অধিকার আরও দৃঢ় করা হয়েছে। তদুপরি নদী আজ বড়ো অসহায়।

'বিশ্ব নদী দিবস' একটি বৈশ্বিক উদ্‌যাপন। নদীর বহুমাত্রিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে এর প্রতি দায়বদ্ধ হওয়ার শিখন। সারা বিশ্বের সব নদীর প্রতিটি নৌপথ যাতে সুগম-নিরাপদ-বাধাহীন হয় তার প্রতি অঙ্গীকার। নদীর এখনকার স্বাস্থ্য যাতে ঠিক থাকে, আগামীতেও সুস্থ রাখা যায়, সব নাগরিকের মধ্যে সেই বোধ জাগ্রত করা। ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবার বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও উদ্‌যাপিত 'বিশ্ব নদী দিবস'। নদী সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবার দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'মানুষের জন্য নদী'। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগে এ দিবস উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর নদী ও পরিবেশ ভাবনা এবং আমাদের করণীয়' শীর্ষক সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি

সংগঠনও নদী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

১৯৮০ সাল থেকে বিশ্ব নদী দিবস হিসেবে পালন করতে শুরু করে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। যার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল বিসি রিভারস ডে পালন দিয়ে। ১৯৮০ সালে কানাডার খ্যাতনামা নদীবিষয়ক আইনজীবী মার্ক অ্যাঞ্জেলো দিনটি 'নদী দিবস' হিসেবে পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিসি রিভারস ডে পালনের সাফল্যের হাত ধরেই তা আন্তর্জাতিক রূপ পায়।

২০০৫ সালে জাতিসংঘ নদী রক্ষায় জনসচেতনতা তৈরি করতে 'জীবনের জন্য জল দশক' ঘোষণা করে। সে সময়ই জাতিসংঘ দিবসটি অনুসমর্থন করে। এরপর থেকেই জাতিসংঘের বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা দিবসটি পালন করছে, যা দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে রিভারাইন পিপল ২০১০ সাল থেকে এ দিবস পালন শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার নদ-নদী রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। সচেতনতা বাড়াতে নানামুখী পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যতবার নদী সুরক্ষার তাগিদ দিয়েছেন তিনি, এত তাগিদ আর কেউ দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি প্রতিনিয়ত বলেন, নদীর পানি বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। শুধু তাই নয় অর্ধশত বছরে বাংলাদেশে নদী খননে সবচেয়ে বেশি টাকা বরাদ্দ এসেছে শেখ হাসিনার শাসনামলে। অনেকগুলো নৌপথকে পুনরায় জীবনদানের চেষ্টা চলছে। নদী থেকে অবৈধ স্থাপনাও অনেক উচ্ছেদ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা নদী সুরক্ষায় আন্তরিক।

নদীর প্রবাহ ধরে রাখতে আন্তরিক হওয়ার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর

নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ধরে রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৬ই নভেম্বর শেরেবাংলা নগরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এই তাগিদ দেন তিনি। গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, নদীভাঙন রোধের প্রধান কৌশল হচ্ছে পানির স্রোত বা প্রবাহ ধরে রাখা। এজন্য নদী খননের মাধ্যমে নাব্যতা বজায় রাখতে হবে। কোনো কারণে যেন পানির স্রোত কোথাও বন্ধ না হয়, সংশ্লিষ্টদের সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী।

সূত্র: নদীবাংলা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সংখ্যা, বিআইডব্লিউটিএ-এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা

প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নে বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হওয়ার কারণে নদীর সংকট বেড়েই চলেছে। বছর দুই আগে নদী খননের জন্য বিশাল অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সেই অর্থ দিয়ে নদী খনন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, মৎস্য বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, এলজিইডিসহ সরকারের অনেকগুলো দপ্তর এসব কাজে প্রযুক্ত। নদী রক্ষার কাজগুলো যাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় সেজন্য সরকারের কয়েকটি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে। তবে কোনো কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নদী রক্ষার অনুশাসন বাস্তবায়নে তৎপর না-হওয়ার কারণে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নদী খনন করা হয়নি। অজ্ঞতা ও গাফিলতির

কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নদী খনন করা হয়েছে ধ্বংসাত্মকভাবে। কখনো কখনো একটি নদীর মূল প্রবাহকে কেটে কেটে সরু সরু তিনটি প্রবাহ তৈরি করেছে। নদীর প্রস্থ মেপে নদী কাটার সংস্কৃতিই চালু করা যায়নি। বলাবাহুল্য এসব অবহেলার কারণে আজ আমাদের দেশের নদীসমূহের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

২,২০০ কিলোমিটার নৌপথ খনন সম্পন্ন

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নৌপথের উন্নয়নের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক। ১৮ই নভেম্বর বিআইডব্লিউটিএ'র নারায়ণগঞ্জস্থ স্থাপনা, ড্রেজিং কার্যক্রমসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি। সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান বলেন, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ পরবর্তী স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল করার উদ্যোগ নেন। ...

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ ও ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে পুনরায় নৌপথের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন এবং নৌপথ উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন; যার মধ্যে রয়েছে রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। নৌপথের উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নদীর নাব্যতা ফেরানো, নদী দখল এবং দূষণ রোধ করে নদী তীরবর্তী এলাকার সৌন্দর্য বাড়ানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান সরকার ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সারা দেশে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে জানিয়ে কমডোর গোলাম সাদেক বলেন, এরই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যেই প্রায় ২ হাজার ২০০ কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার বহরে বর্তমানে ৪৫টি ড্রেজার রয়েছে। আরো ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান আছে। এছাড়া বর্তমান সময়ের চাহিদা বিবেচনায় দক্ষ নৌকর্মী তৈরিতে বরিশাল ও মাদারীপুরে নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এজন্য প্রশিক্ষণ জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষণকাজে ব্যবহার হবে।

সূত্র: নদীবাংলা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সংখ্যা, বিআইডব্লিউটিএ-এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নদীবিষয়ক বিবিধ প্রতিকূল বাস্তবতার মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নদী রক্ষাবিষয়ক নির্দেশনা পালন করার কোনো বিকল্পও আমাদের নেই। নদী রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহেলা জবাবদিহির আওতায় আনা জরুরি। একইসঙ্গে নদী দূষণকারী, দখলকারী ও ধ্বংসকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য গণসচেতনতা যেমন খুবই প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তাৎক্ষণিক আইনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। আমাদের জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এ কমিশন নদী রক্ষায় স্বাধীন ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করলেই নদীর প্রবাহ গতিশীল হবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নদী রক্ষার নির্দেশনা বার বার করে দেন, সেখানে নদীমাতৃক এ দেশেই নদী মারা যাবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে– এমন আশঙ্কা খুবই দুঃখজনক। এখনই প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নদী রক্ষার নির্দেশনাসমূহের সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সচেতন ও তৎপর না হলে এবং নদী রক্ষায় আপামর জনগণ সর্বাত্মকভাবে এগিয়ে না এলে আর কখনোই এদেশে নদী রক্ষা হবে কি না– তা বলা কঠিন। আমরা চাই, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার যথাযথ প্রতিপালন হোক, নদীর সুরক্ষা নিশ্চিত হোক। যদি আমরা নদী রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর মতো আন্তরিক ও সক্রিয় হই, তবেই নদীর সুরক্ষা সম্ভব। এই দৃঢ়প্রত্যয় বাস্তবায়নের আন্তরিক প্রচেষ্টাই হোক ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মজয়ন্তীতে আমাদের অঙ্গীকার ও জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

প্রফেসর ড. তুহিন ওয়াদুদ: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং নদী রক্ষাবিষয়ক সংগঠন রিভারাইন পিপলের পরিচালক, wadudtuhin@gmail.com

পাঠ্যপুস্তকে ৭ই মার্চের ভাষণ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সেইসঙ্গে ভাষণ প্রদানের স্থানে বঙ্গবন্ধুর তর্জনী উঠানোর একটি ভাস্কর্য স্থাপনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ৮ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহসান এবং বিচারপতি শাহেদ নূর উদ্দীনের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ দেয়।

এ বিষয়ে রিটকারী অ্যাডভোকেট বশির আহমেদ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে হাইকোর্ট সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) ভাষণ প্রদানকালে তর্জনী উঠানো ভাস্কর্য স্থাপনের জন্য বলেছে। ভাস্কর্য স্থাপনের লক্ষ্যে একটি কমিটি করতেও বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২০শে নভেম্বর এ বিষয়ে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ড. বশির আহমেদ। প্রাথমিক শুনানি শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণের স্থানে মঞ্চ পুনর্নির্মাণ করে সেখানে তাঁর ভাস্কর্য এবং ৭ই মার্চকে ঐতিহাসিক জাতীয় দিবস হিসেবে কেন ঘোষণা করা হবে না–এই মর্মে রুল জারি করে।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ঐতিহ্য রক্ষায় সরকারের পদক্ষেপ জানতে চায় হাইকোর্ট। এরই ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত আদেশ দেয় আদালত।

প্রতিবেদন : তারিন রহমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ প্রান্তে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ২৩শে জুন ২০২১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'শেখ হাসিনার নেতৃত্বের চার দশক: সংগ্রামী নেতা থেকে কালজয়ী রাষ্ট্রনায়ক' শীর্ষক তথ্যচিত্র গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

শেখ হাসিনার চার দশকের সংগ্রাম

শামসুজ্জামান শামস

দেশের সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। আশির দশকের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ সম্মেলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসূরি শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করে। তিনি দলের দায়িত্ব নিয়েই জেনারেল জিয়ার সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরেই বাংলার মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করেন। ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারের সময়ে জেলে নিলেও শেখ হাসিনাকে দমিয়ে রাখা যায়নি। জনগণের চাপে সেনা সমর্থিত সরকার বঙ্গবন্ধুকন্যাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৮১ থেকে ২০২১ সাল, মাঝে পেরিয়ে গেছে ৪০ বছর। এসময়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পিতার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ, এমনকি বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছেন। নিজ মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও মানবতার কারণে তিনি আজ বিশ্বজয়ী একজন রাজনীতিবিদ। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিগত গুণাবলি অনেকের কাছেই গবেষণার বিষয়। বিশ্বের নারী নেত্রীদের মধ্যে সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে শেখ হাসিনার অবস্থান মেয়াদের দিক দিয়ে তৃতীয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বের নারী রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে শেখ হাসিনা এখন বিশ্বসভায় আলোকিত একজন শাসক হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করতে পেরেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এসময় তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রবাসে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৮১ সালের ১৪, ১৫ ও ১৬ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। এরপর দীর্ঘ নির্বাসিত সময় কাটানোর পর ১৭ই মে দেশে ফিরে আসেন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে দীর্ঘ নির্বাসন শেষে শেখ হাসিনা বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন। ওই দিনটি ছিল রবিবার। সেদিন বিকেল সাড়ে ৪টায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে তৎকালীন ঢাকা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে তাঁকে একনজর দেখার জন্য কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শেরে বাংলা নগর পর্যন্ত এলাকাজুড়ে লাখো জনতার ঢল নামে। সারা দেশের গ্রামগঞ্জ-শহর-নগর-বন্দর থেকে অধিকার বঞ্চিত মুক্তিপাগল জনতা সেদিন ছুটে এসেছিল রাজধানী ঢাকায়। এসময় সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী লাখো কণ্ঠের স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা বিমানবন্দর এলাকা।

বাংলাদেশের জন্য ধারাবাহিক অগ্রগতি আর সম্মানের পথটি দিন দিন প্রশস্ত করে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দেশ ও মানুষের উন্নয়নের কাজে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মজীবন চার দশকের। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনা তিনটি সংসদীয় আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে নব্বইয়ের ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং এই আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর এইচএম এরশাদ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। ১৯৯১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনা পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দলসহ সকলকে সংগঠিত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এক ডিজিটাল বাংলাদেশের। যেখানে সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি থাকবে এবং স্বাধীনতার চার দশক পরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করছেন। তিনি একজন অনুকরণীয় নেতৃত্ব– খাদ্য নিরাপত্তা, শান্তিচুক্তি, সমুদ্র বিজয়, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষায় সমুজ্জ্বল।

১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে চার মেয়াদে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে, যা উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি রেকর্ড। যে শেখ হাসিনা একজন গৃহবধূ হিসেবে সংসার পেতেছিলেন, তিনি এখন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শুধু পরিচিতই নন, তিনি এখন

একবিংশ শতকের একজন মডেল রাষ্ট্রনায়ক। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে যে-কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামে তিনি যখন কথা বলেন, বিশ্বের অন্য নেতারা তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। জাতিসংঘের মহাসচিব বা বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট সবাই স্বীকার করেন শেখ হাসিনার কাছে বিশ্বের সরকারপ্রধানদের শেখার আছে অনেক কিছু। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বলেছেন, শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটেছে। কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মন্ত্রী মেরি ক্লদ বিবেউ বলেছেন, শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ার স্তম্ভ। অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, মেধা, বিচক্ষণতা, আত্মপ্রত্যয় ও দূরদর্শিতার কারণে শেখ হাসিনা এখন বিশ্বনেত্রী। ২০১১ সালে *নিউইয়র্ক টাইমস* সাময়িকীর জরিপে বিশ্বের সেরা প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর নারী নেতৃত্বের মধ্যে তিনি সপ্তম স্থানে ছিলেন। ব্রিটিশ সংবাদপত্র *গার্ডিয়ানের* এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী নারী সরকারপ্রধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বিশ্ব বিখ্যাত *ফোর্বস* ম্যাগাজিন জরিপে নভেম্বর ২০১৭ সালে বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় ৩০তম অবস্থানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স-এর সর্বশেষ গবেষণায় বিশ্বসেরা পাঁচজন কর্মঠ এবং পরিশ্রমী সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স'-এ ১৭৩টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের মধ্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও সৎ সরকারপ্রধান হিসেবে এ তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ডেকিন ইউনিভার্সিটির 'সেন্টার ফর হিউম্যান লিডারশিপ' ২০১৭ সালের জন্য পোপ ফ্রান্সিস এবং বিল গেটসকে পেছনে ফেলে 'মানবতার চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে মনোনীত করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ, যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। তাঁর সাহসী এবং গতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঠামোগত রূপান্তর এবং উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি মহামারি করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে বহির্বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রভাবে গোটা বিশ্বের মতো দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাবসাবাণিজ্য, কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পসহ অর্থনীতির সব খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ দফা নির্দেশনাসহ ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে নানামুখী দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে। বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয় এবং নগদ অর্থ বিতরণসহ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে।

সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও উৎকর্ষসাধন এবং প্রাজ্ঞ রাজস্বনীতি ও সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত এক দশকে গড়ে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ ও পরপর তিন বছর ৭ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশে উন্নীত হয়। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির এই ধারাবাহিক অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫ দশমিক ২৪ শতাংশে। তবে একই সময়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় ৮ দশমিক ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলারে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

সততা, নিষ্ঠা, রাজনৈতিক দৃঢ়তা, গণতন্ত্র, শান্তি, সম্প্রীতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের অনন্য রূপকার আর মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ শেখ হাসিনা। দুঃখী মানুষের আপনজন, নির্যাতিত জনগণের সহমর্মী তথা ঘরের লোক। শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বাবার মতো আমাকে যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয়, আমি তা করতে প্রস্তুত'। শান্তির অগ্রদূত শেখ হাসিনা দেশের মানুষের জন্য নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করতে পারেন নির্দ্বিধায়। সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু তিনি। ধৈর্য ও সাহসের প্রতিমূর্তি শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের মানসকন্যা, দেশরত্ন, কৃষকরত্ন, জননেত্রী–বহুমাত্রিক জ্যোতিষ্ক। তাঁকে কেন্দ্র করে, তাঁর নেতৃত্বে আবর্তিত হচ্ছে বাংলাদেশের সবকিছু। সব দলের অংশগ্রহণে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অভাবনীয় জয় পেয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। বেসরকারিভাবে ঘোষিত ২৯৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট পেয়েছে ২৮৮টি আসন। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গড়ে নির্বাচনে আসা বিএনপি ও ধানের শীষের প্রার্থীরা পেয়েছেন সাতটি আসন। টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ জাতিকে উপহার দিয়েছেন পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তি ও স্বাধীনতার সাধ। আর তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতির বুকে চেপে বসা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন এবং মানুষের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই কাজ করতে গিয়ে বার বার বুলেট ও গ্রেনেডের মুখে পড়তে হয়েছে জাতির পিতার কন্যাকে। বার বার স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক অপশক্তি তাঁর ওপর বুলেট ও গ্রেনেড হামলা চালিয়ে তাঁকে শেষ করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই জনগণের বিপুল ভালোবাসা ও আশীর্বাদে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছেন। শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য কমপক্ষে ১৯ বার সশস্ত্র হামলা করা হয়। এর মধ্যে ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে তাঁকে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে যুবলীগ নেতা নূর হোসেন, বাবুল ও ফাত্তাহ নিহত হন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তাঁকেসহ তাঁর গাড়ি ক্রেন দিয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ১৯৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে পুলিশবাহিনী লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনায় শেখ হাসিনা অক্ষত থাকলেও ৩০ জন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী নিহত হন। ১৯৯১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন চলাকালে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। ১৯৯৪ সালে ঈশ্বরদী রেল স্টেশনে তাঁর কামরা লক্ষ্য করে অবিরাম গুলিবর্ষণ করা হয়। ২০০০ সালে কোটালীপাড়ায় হেলিপ্যাডে এবং শেখ হাসিনার জনসভাস্থলে ৭৬ কেজি ও ৮৪ কেজি ওজনের দুটি বোমা পুঁতে রাখা হয়। বিএনপি সরকারের সময় সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা হয় ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট। ঐদিন বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে এক জনসভায় বক্তব্য শেষ করার পরপরই তাঁকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা করা হয়। ইতিহাসের ভয়ংকর ও লোমহর্ষক সেই

হামলায় শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পেলেও আইভি রহমানসহ তাঁর দলের ২২ নেতাকর্মী নিহত হন এবং পাঁচশোর বেশি মানুষ আহত হন। শেখ হাসিনা নিজেও কানে আঘাত পান।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা প্রথমবার ক্ষমতাসীন হন। ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত এ পাঁচ বছরে শেখ হাসিনা দেশ ও জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় ফিরিয়ে আনেন। দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে তিনি মাত্র পাঁচ বছরে দেশের চেহারা পালটে দেন। ১৯৯৬-২০০১ শাসনামলকে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে শেখ হাসিনার শাসন এই দেশটির জন্য শুধু একটি আশীর্বাদই নয়, একটি টার্নিং পয়েন্টও।

একসময় বিদ্যুতের অভাবে লোডশেডিং সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল, তা এখন মানুষ ভুলতে বসেছে। যে দেশের মানুষ তিন দশক আগেও গরুর গাড়িতে চড়তে অভ্যস্ত ছিল, সেই দেশ এখন মহাশূন্যে নিজস্ব উপগ্রহ পাঠায়, নিজের অর্থায়নে পদ্মা সেতু বানায়। একটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দ্বারপ্রান্তে। এত সব অর্জনের কৃতিত্ব শেখ হাসিনার। বঙ্গবন্ধুকন্যা আক্ষরিক অর্থেই এখন বাংলাদেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। ২০১৮ সালের ১১ই মে মহাকাশে বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বিশ্বের স্যাটেলাইটের মালিক দেশের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করে বাংলাদেশ।

বিশ্বের নারী নেত্রীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশিদিন সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের কাতারে শেখ হাসিনার অবস্থান তৃতীয়। শ্রীলংকার প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েকে আধুনিক বিশ্বের প্রথম নারী সরকারপ্রধান ছিলেন। শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি তিন দফায় ১৭ বছর ২০৮ দিন দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন ভারতের প্রথম ও একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি দুই দফায় ১৬ বছর ১৫ দিন দেশটির সরকারের নেতৃত্ব দেন। ক্যারিবিয়ান দেশগুলোর মধ্যে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়া ডোমিনিকা প্রজাতন্ত্রের ইউজিনিয়া চার্লস ক্ষমতায় ছিলেন ১৪ বছর ৩২৮ দিন। ২০০৫ সাল থেকে একটানা জার্মানির ক্ষমতায় আছেন চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মারকেল। ২০২১ সালে তাঁর মেয়াদ শেষ হবে। আফ্রিকার দেশ লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে একটানা ১২ বছর ছয়দিন দায়িত্ব পালনের পর এলেন জনসন সারলিফ ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা ছাড়েন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা তিন দফায় ১৫ বছর দায়িত্ব পালনের পর বর্তমানে চতুর্থ মেয়াদে আরও ৫ বছরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ মেয়াদ পূর্ণ করলে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে বিশ্বে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবেন।

স্বাস্থ্য খাতেও শেখ হাসিনা সরকারের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিশুমৃত্যুর হারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সফলতা দেখিয়েছে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ। ২০০৭ সালে দেশে যেখানে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৬৫ জন সেখানে এই হার ২০১৩ সালে ৩৬ জনে হ্রাস পায়। এছাড়া বাংলাদেশে সার্ক দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯১ শতাংশ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জিত হয়েছে। দেশের প্রান্তিক-দরিদ্র রোগীদের সেবাদানের জন্য গৃহীত কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পও গত ১০ বছরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ বেশ ভালোভাবেই করোনাকে সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে। করোনার ভয়াল থাবা যা গোটা জাতিকে ভাবিয়ে তুলেছে, ঠিক তখন দেশের বিভিন্ন জেলা ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয়। বন্যা ও করোনা কারণে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে, বাংলাদেশ একটি বড়ো ধরনের দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এ অবস্থা সরকার হয়ত সামাল দিতে পারবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশকে সে অবস্থায় উপনীত হতে হয়নি। করোনা মোকাবিলায় সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালে কমনওয়েলথভুক্ত ৫৪টি দেশের সরকারের মধ্যে সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী তিন নারী নেতার একজন নির্বাচিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অপর দুইজন হলেন– নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আরডার্ন এবং বারবাডোজের প্রধানমন্ত্রী মিয়া আমোর মোতলি।

কৃষি থেকে মহাকাশ, শিক্ষা থেকে সমুদ্রতল সবকিছুতেই এখন বাংলাদেশের জয়জয়কার। বাংলাদেশের এই ইতিবাচক রূপান্তরের পেছনে মূল কৃতিত্বটা বর্তায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ওপরই। কিন্তু উন্নয়নের পথে এই অগ্রযাত্রা সহজ ছিল না। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে তুলে আনতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জঙ্গিবাদ, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র, শরণার্থী সমস্যার মতো বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু অকালে ঘাতকের বুলেটে নির্মমভাবে নিহত হওয়ায় সে স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। বর্তমানে পিতার সেই অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণেই কাজ করে চলেছেন শেখ হাসিনা।

আইএমএফ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয়।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে গত এক দশকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় চার গুণ হয়েছে। সামাজিক কর্মকাণ্ড, শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা সম্মানিত করেছে। গত এক যুগ ধরে দেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বের বিস্ময় হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে এরই মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার মানদণ্ড পূরণ করেছে বাংলাদেশ। অর্থনীতির

আকারের দিক থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৪৩, আর ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় বিশ্বের ৩৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রাইসওয়াটার কুপার হাউস (পিডাব্লিউসি) বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৮তম বড়ো অর্থনীতির দেশ, ২০৫০ সালে আরও পাঁচ ধাপ এগিয়ে আসবে ২৩ নম্বরে। বাংলাদেশকে 'ইমার্জিং টাইগার' উল্লেখ করে বিশ্বখ্যাত সংবাদমাধ্যম *বিজনেস ইনসাইডার* বলেছে, এশিয়ায় টাইগার বলতে এত দিন সবাই হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানকে বুঝত। এর বাইরেও এশিয়ায় একটি ইমার্জিং টাইগার রয়েছে, যেটি হলো বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত 'ইনক্লুসিভ ইকোনমিক ইনডেক্স'-এ ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ।

ত্যাগে, দয়ায়, ক্ষমায় ও সাহসের মহিমায় শেখ হাসিনা আজ বিশ্বের বিস্ময়। শেখ হাসিনা শুধু আওয়ামী লীগেরই নেতা নন, তিনি আজ দলমতের উর্ধ্বে উঠে স্টেটসম্যান বা রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পন্ন হতে চলেছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। পিছিয়ে পড়া বাংলার জনপদে তিনি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আন্দোলনের স্লোগান তুলে দেশের চেহারা বদলে দিয়েছেন। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির এক নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও ল্যাপটপ জরুরি কাজ সমাধা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কারো কাছে নতজানু হয়ে নয়, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই এখন দেশ শাসন করছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। তাঁর সময়েই বাস্তবায়িত হয়েছে ৬৮ বছরের কষ্ট আর ৪১ বছরের প্রতীক্ষিত সীমান্ত চুক্তি। তাঁর শাসনামলে সমুদ্রসীমা জয় করেছে বাংলাদেশ, যা বাংলাদেশের ভৌগোলিক ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। শেখ হাসিনার আমলেই বিশ্বব্যাংককে চ্যালেঞ্জ করে নির্মিত হচ্ছে দেশের বৃহত্তম পদ্মা সেতু। তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আদায়ে ভূমিকা রেখেছেন।

বাংলার মানুষের বক্তব্য, শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে মানবতার নেত্রী হিসেবে সাধারণ মানুষের মাঝে আস্থা করে নিয়েছেন। বিশ্বে এখন তিনি মাদার অব হিউম্যানিটি বা 'মানবতার মা'। তিনি আজ তৃতীয় বিশ্বের একজন বিচক্ষণ বিশ্বনেতা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, উদার, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জীবনদৃষ্টি তাঁকে করে তুলেছে এক আধুনিক, অগ্রসর রাষ্ট্রনায়ক।

ফোর্বস পত্রিকা ২০১৮ সালে বিশ্বে ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় ২৬তম স্থানে রাখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। বিশ্ববাসী তাঁকে দিয়েছে নানা উপাধি। 'নারী অধিকারের স্তম্ভ' বলেছেন কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মন্ত্রী মেরি ক্লদ বিবেউ। 'মানবিক বিশ্বের প্রধান নেতা' বলেছে অক্সফোর্ড নেটওয়ার্ক অব পিস নামক একটি সংস্থা। শ্রীলংকার *গার্ডিয়ান* পত্রিকা তুলনা করেছে 'জোয়ান অব আর্ক'-এর সঙ্গে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘ ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে ইউনেসকো তাঁকে হুপে-বোয়ানি শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ হাসিনাকে সম্মানজনক 'সেরেস' (CERES) মেডেল প্রদান করে। এছাড়া ২০১৪ সালে ইউনেসকো তাঁকে 'শান্তিবৃক্ষ' এবং ২০১৫ সালে উইমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাঁকে রিজিওনাল লিডারশিপ পুরস্কার এবং গ্লোবাল সাউথ-সাউথ ডেভেলপমেন্ট এক্সপো ২০১৪ ভিশনারি পুরস্কারে ভূষিত করে। জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে শেখ হাসিনাকে তাঁদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দি আর্থ ২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মানবতার জননী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে, যা মোটেও সোজা কাজ ছিল না। এসব একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বেই সম্ভব হচ্ছে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা, কৃষি উন্নয়ন, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে, পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক বৃদ্ধি প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি ও পরিশ্রমের ফসল। এছাড়া চলমান রয়েছে পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা ও মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ। শত বাধা-বিপত্তি এবং হত্যার হুমকিসহ নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে শেখ হাসিনা ভাত-ভোট এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য অবিচল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। সামাজিক কর্মকাণ্ড, শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা সম্মানিত করেছে।

শামসুজ্জামান শামস: কথাসাহিত্যিক ও হেড অব স্পোর্টস ডেস্ক, দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, bk.shams@yahoo.com

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড চালু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক দর্শন বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের ক্যালিফোর্নিয়া শাখা এবং বিশ্বখ্যাত বিদ্যাপীঠ ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ২১শে জুলাই স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে এই প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর নামে গবেষণা পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী, বঙ্গবন্ধু পরিষদ বার্কলে ফাউন্ডেশনকে প্রতিবছর ২০ হাজার ডলার অনুদান দেবে। বার্কলের সাউথ এশিয়া স্টাডিস গবেষণার জন্য আবেদন গ্রহণ করবে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সব অ্যাক্রিডেটেড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স, পিএইচডির শিক্ষার্থী এবং সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র ফ্যাকাল্টি বঙ্গবন্ধু অথবা বাংলাদেশের ওপর গবেষণায় ইচ্ছা প্রকাশ করে আবেদন করতে পারবে। বার্কলের গবেষণা বিষয়ক ভাইস চ্যান্সেলরের ডিপার্টমেন্ট এই গবেষণা তদারকি করবে। গবেষণার খরচ বঙ্গবন্ধু পরিষদের ক্যালিফোর্নিয়া শাখার দেওয়া অনুদান থেকে বহন করা হবে। গবেষণা বিষয়ক ভাইস চ্যান্সেলরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি গবেষণা অনুমোদন করলে, গবেষক ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে ক্যাম্পাসে এসে তার গবেষণার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী এবং ফ্যাকাল্টির কাছে প্রকাশ এবং মতবিনিময় করবে।

প্রতিবেদন: শিহাব শুভ

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা

শামস সাইদ

শেখ হাসিনার রাজনীতিতে আসা একটা স্বপ্ন কিংবা ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে। এভাবে রাজনীতিতে আসতে চাননি তিনি। তাঁকে বাধ্য করেছে সময়। বাংলার মানুষের চাহিদা হোক আর বাবার স্বপ্ন পূরণ যেটাই বলি, এরমধ্যে দিয়েই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ। ১৯৮১ সালে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতেই আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক লড়াই।

১৯৯৬ সালের ১২ই জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে শেখ হাসিনার হাত ধরে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯৬-২০০১ পাঁচ বছর ছিল স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল সময়।

শেখ হাসিনার শাসনামলে ১৯৯৮ সালে যমুনা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। প্রথম মুঠোফোন (মোবাইল) প্রযুক্তির বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং উল্লেখযোগ্য হারে কর সুবিধা প্রদান করা হয়। বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেল অপারেট করার অনুমতি প্রদান করে আকাশ সংস্কৃতিকে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। পিতার সঙ্গে মাতার নাম লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়। কম্পিউটার আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসকরণের দ্বারা সাধারণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ অবারিত করে দেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৪২ লাখ ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটি ১০ লাখ মানুষকে প্রায় ৯ মাস বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষিঋণ আদায় এক বছর বন্ধ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্যিক শীর্ষ সম্মেলন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার নতুন পথ উন্মুক্ত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার গঙ্গার পানি বণ্টনের সমস্যা সমাধানে মোটেও বিলম্ব করেনি। ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্থায়ী যৌথ নদী কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বরে একটি যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে ভারতকে ২১শে এপ্রিল থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত ৪১ দিনের জন্য বাঁধের সংযোগ খালগুলো পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত একতরফা গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে নেয়।

১৯৭৭ সালের নভেম্বরে জিয়াউর রহমান সরকারের সঙ্গে পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮২ সালে সে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। ১৯৮২ সালের ৪ঠা অক্টোবর জেনারেল এরশাদ সরকার ভারতের সঙ্গে পানি বণ্টন বিষয়ে দুবছর মেয়াদি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। ১৯৮৫ সালের ২২শে নভেম্বর তিন বছরের জন্য আরেকটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। সর্বশেষ চুক্তিতে বাংলাদেশের ৩৪,৫০০ কিউসেক পানি পাওয়ার কথা থাকলেও ভারত ১৯৯৩ সালের শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশে ১০ হাজার কিউসেকেরও কম পানির প্রবাহ রাখে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর গঙ্গার পানি বণ্টন সম্পর্কে নতুন করে আলোচনা শুরু করেন শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে হায়দ্রাবাদ হাউজে মোগল ডাইনিং হলে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড জনসংহতি সমিতির ইতিহাসে এক সংকটময় অবস্থার সূচনা করে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে শান্তিবাহিনী সামরিক দিক থেকে অধিকতর সংগঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি সাঁজোয়া বহরের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পালটা আক্রমণ শুরু করে। ১৯৭৯ সালে ঐ অঞ্চলে বাঙালি বসতি স্থাপনের এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৯১ সাল নাগাদ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালির সংখ্যা দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার ৪৮.৫%; অথচ বসতি স্থাপন কর্মসূচির আগে ১৯৭৪ সালে সেখানে বাঙালির সংখ্যা ছিল প্রায় ১১.৬%। ১৯৮৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে একটি আইন পাস করে সরকার রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান–এ তিনটি জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন শেখ হাসিনা। এই সময় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন।

শেখ হাসিনা সরকার গঠনের ১১০ দিনের মাথায় ১৯৯৬ সালের ১৪ই অক্টোবর সংসদে তৎকালীন চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্যের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। ২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭ থেকে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত বৈঠক চলে। ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ১২.৫০ মিনিটে শান্তিবাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা একটি চাইনিজ রাইফেল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে অনানুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র জমা দেয়। শেখ হাসিনা শান্তিবাহিনী নেতার হাতে তুলে দেন সাদা গোলাপ।

২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬৪টি আসন লাভ করে। ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠন করে। ২০০৯ সালের ২৪শে জুলাই আওয়ামী লীগের সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে ন্যামের ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১০ সালে মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান অ্যান্ড স্যাশ বাংলাদেশকে 'সম্মুখের সারির বাজার' এবং 'একাদশ উদীয়মান' দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে।

২০১১ সালের ৩০শে জুন জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল ২৯১-১ ভোটে পাস হয়। সংশোধনীতে ১৯৭২-এর মূলনীতি পুনর্বহাল, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীদের জন্য ৫০ আসন সংরক্ষণ, দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্যসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০১২ সালের ১৪ই মার্চ মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত মামলায় সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS)-এর রায়ে বঙ্গোপসাগরে ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটারের বেশি সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালের ২৮শে এপ্রিল সমুদ্রজয় উদ্‌যাপন নাগরিক কমিটি বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

২০১২ সালের ১৯শে জুন ছোটো বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থ ও এর ইংরেজি সংস্করণ *The Unfinished Memoires*-এর মোড়ক উন্মোচন করেন শেখ হাসিনা। ২০১২ সালের ১০ই আগস্ট দেশের প্রথম ডিজিটাল কোরান শরিফ উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০১৩ সালের ১৮ই আগস্ট গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশি পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক সহায়তায় বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে একদল গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয় যুগান্তকারী এ সফলতা। ২০১৩ সালের ২রা অক্টোবর পাবনার ঈশ্বরদীতে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর দূরত্ব কমাতে পদ্মা নদীর ওপর সেতু তৈরির স্বপ্ন দীর্ঘদিনের। দেশের সব রাষ্ট্রনায়ক ও সরকারপ্রধান এ স্বপ্ন পূরণের উপায় খুঁজেছেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের ইশতাহারে পদ্মা সেতু নির্মাণের বিষয়টি উল্লেখ করেছিল আওয়ামী লীগ। পদ্মা সেতুর অগ্রগতিসাধনে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে শেখ হাসিনাকে। দেশি-বিদেশি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণে বিশ্বব্যাংকসহ দাতা সংস্থাগুলো এই প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর অর্থায়ন স্থগিত করে। ২০১২ সালের ২৯শে জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণচুক্তি বাতিল করে। এত কিছুর পরও টলানো যায়নি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। নিজের সংকল্পে অটল থাকেন তিনি। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা শুরু হয় পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য। ২০১৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর মূল সেতুর কার্যক্রম শুরু হয় নিজেদের অর্থায়নেই। অবশেষে শেখ হাসিনার অদম্য আত্মবিশ্বাসের কাছে হার মেনেছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ষড়যন্ত্র। কোনো কিছুই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কাজ থামাতে পারেনি। পদ্মা সেতু এখন আর স্বপ্ন নয়, যা পদ্মার বুকে দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে।

২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ।

এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৩শে ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়ি আর ঝাউবীথির বুক চিরে গড়ে তোলা শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্‌বোধন করেন শেখ হাসিনা।

৬ই জুন ছয় দিনের সফরে চীন গমন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৯ই জুন বেইজিংয়ে তাঁর সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেছিয়াংয়ের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সফরে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দুটি চুক্তি, দুটি সমঝোতা স্মারক এবং দুটি বিনিময়পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশে একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও চীনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ।

৭ই জুলাই নেদারল্যান্ডসের হেগের সালিসি আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ই জুলাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে রায়টি প্রকাশ করে।

২১শে জুলাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের বিশেষ আমন্ত্রণে গার্ল সামিট ১৪-তে যোগ দিতে যুক্তরাজ্য গমন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সফরে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় সফররত জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সঙ্গে গণভবনের শিমুল কনফারেন্স হলে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য আগামী পাঁচ বছরে ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর 'সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল ২০১৪' জাতীয় সংসদে পাস হয়। প্রধান বিরোধী দল জাপাসহ অন্য

বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে বিলের পক্ষে 'হ্যাঁ' ভোট দিয়ে বিরোধিতা ছাড়াই নির্বিঘ্নে বিলটি পাস করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৬৯তম সাধারণ অধিবেশন এবং ২৯তম বিশেষ অধিবেশনের ক্রেডেনশিয়াল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে।

২০১৫ সালের ৭ই মে ভারতে লোকসভায় পাসকৃত সীমান্ত চুক্তি বিল অনুযায়ী ২০১৬ সালের ৩০শে জুন বাংলাদেশের ভেতরে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহল এবং ভারতে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল বিনিময় করা হয় দেশরত্ন শেখ হাসিনার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায়। এমন শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুটি দেশের মধ্যে এতগুলো ছিটমহল বিনিময়ের নজির বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই।

১৪ই অক্টোবর ২০১৬ সালে চীনের সঙ্গে উপকূলীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

৮ই এপ্রিল ২০১৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে হায়দ্রাবাদ হাউজের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রতিরক্ষা খাতে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ চুক্তিসহ ২২টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে আরও ৪.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার ঘোষণাও এসেছে এই বৈঠক থেকে। স্বল্পোন্নত দেশ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে বাংলাদেশের। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি কমিটি সিডিপি এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল ইকোসক মানদণ্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৬১০ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২.৯ (বাহাত্তর দশমিক নয়)। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড়ো অর্জন। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আটটি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যু হার কমানো এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মন্তব্য– 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার এবং জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।'

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো– শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রতি বছর দুই কোটি তিন লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি, উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৬৫টি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪৬৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার হার ৭৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে। শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট'।

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১' প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকার। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুস্থ, এতিম, অসহায় পথশিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। কৃষি খাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বার বার আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৭ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। স্বল্পসুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে এর শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত ৩৯টি দেশের ৬৪টি শান্তি মিশনে খ্যাতি ও সফলতার সঙ্গে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এযাবৎকালে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে। 'আর্মড ফোর্সেস গোল–২০৩০'-এর আলোকে প্রতিটি বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বহিঃশত্রুর যে-কোনো আক্রমণ বা আগ্রাসন মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সক্ষম করে গড়ে তোলো হয়েছে। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিস্তার রোধে পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ওষুধ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের।

হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। পাতাল রেল নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজও দ্রুত এগিয়ে চলছে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে প্রথম টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-চন্দ্রা মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করার পর চন্দ্রা বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব স্টেশন, বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম স্টেশন, রংপুর এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। নতুন রেলপথ নির্মাণ, নতুন

কোচ ও ইঞ্জিন সংযুক্তি, ই-টিকেটিং এবং নতুন নতুন ট্রেন চালুর ফলে রেলপথ যোগাযোগে নব-দিগন্তের সূচনা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪০১ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে। ১২২টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের দিন থেকেই সেতুর উপর দিয়ে শুরু হবে রেল চলাচল। দেশের সকল জেলাকে রেল যোগাযোগের আওতায় আনা হচ্ছে।

বিমান বহরে ছয়টি নতুন ড্রিম লাইনার যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিজস্ব উড়োজাহাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আঠারোতে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজ চলছে।

৯৫ শতাংশ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে গেছে। ৯৭ ভাগ মানুষ উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় এসেছে। টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য রামপাল, মাতারবাড়ি, পায়রা ও মহেশখালীতে মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মহেশখালীতে এলএনজি টার্মিনাল থেকে দৈনিক ৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে।

তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ১২,৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে। ৩১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে পঞ্চাশ শয্যায়। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টি মেডিকেল কলেজ, নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেও বেশি জনশক্তি। উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে সুযোগ-সুবিধা। স্থাপন করার হয়েছে হৃদরোগ, কিডনি, ক্যানসার, নিউরো, চক্ষু, বার্ন, নাক-কান-গলাসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। অব্যাহত নার্সের চাহিদা মেটাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নার্সিং ইনস্টিটিউট। প্রতিটি জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের কাজ চলছে।

খাদ্যশস্য, মাছ এবং মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। চাল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান চতুর্থ এবং মাছ ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়।

মেগাসিটি ঢাকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তীব্রগতিতে ছুটে চলবে দেশের প্রথম মেট্রোরেল– সেদিন আর বেশি দূরে নয়। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে মেট্রোরেল প্রকল্পের।

কেউ যাতে গৃহহীন না থাকে সেজন্য একাধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে সরকার। জমি আছে ঘর নেই এমন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ভূমিহীন, নদীভাঙনে উদ্বাস্তুদের জন্যও ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। চৌদ্দ হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একতলা পাকা বাড়ি নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের সফলতা দেখিয়েছে বাংলাদেশ।

মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত বাংলাদেশ তখন বিভিন্ন উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে মন্দা মোকাবিলায় সক্ষমই শুধু হয়নি, জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ছয়-এর বেশি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিটেন্সের পরিমাণ। ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার মানদণ্ডে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জিত হয়েছে। ডিজিটাল অর্থনীতিতে চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করে হুয়াওয়ের গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনডেক্স ২০১৯-এর টপ মুভার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তালিকায় থাকা বাকি তিন দেশ হচ্ছে ইউক্রেন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আলজেরিয়া। ডিজিটাল অর্থনীতিতে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনার মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে নীতিনির্ধারক ও স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যেই গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনডেক্স বা বৈশ্বিক সংযোগ সূচক নকশা করা হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে একটি সুপরিচিত নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাংলাদেশ। জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চহার অর্জনের পাশাপাশি নানা সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার হার ও গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদেরই শুধু নয়, অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

২০১৮ সালে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে স্থান দিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশের প্রমাণ মেলে তার বার্ষিক আর্থিক পরিকল্পনায়। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বিএনপি সরকারের শেষ বছরে বাজেটের আকার ছিল মাত্র একষট্টি হাজার কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেটের আকার প্রায় নয় গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ছয় লক্ষ তিন হাজার ছয়শত একাশি কোটি টাকায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের একটি বাংলাদেশ। এইচবিএসসি'র প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে। 'ডেল্টা প্ল্যান' শত বছরের মহাপরিকল্পনার অধীনে ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য ৮০টি প্রকল্প নেবে সরকার, যাতে ব্যয় হবে প্রায় ২,৯৭৮ বিলিয়ন টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব গতিশীলতা সঞ্চালনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও আধুনিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা। জাতির পিতা যেভাবে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যার সুদৃঢ় নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে।

এছাড়াও শেখ হাসিনার বড়ো অর্জন মানুষের ভালোবাসা। মানুষ তাঁকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাসই রাজা ও প্রজার মাঝে ব্যবধানের সব পর্দা ছেদ করে সবাইকে অভিন্ন দেশের নাগরিকে পরিণত করেছে। জনগণ তাঁকে রক্ষা করতে মানববর্ম তৈরি করে গায়ে-বুকে আগলে রেখেছে। তিনি বলেছেন, আমি বাংলার মানুষের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। জীবন দিয়ে হলেও সোনার বাংলা গড়ব। বাংলার দুখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাবো।

শামস সাইদ: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, shamssaid11@gmail.com

কন্যাশিশুরাও উন্নয়নের অংশীদার

হাছিনা আক্তার

প্রযুক্তির উৎকর্ষে পৃথিবী এগিয়েছে। কন্যা তুমি তুচ্ছ নও, নও তুমি ক্ষুদ্র যদি তুমি জেগে ওঠো, তবে করবে বিশ্ব জয়। কবি নজরুলের ভাষায় আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনে কন্যাশিশুর গুণগান গাইতে চাই আমরা সবাই। কন্যাশিশুর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং তাদের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়কে সামনে রেখে প্রতিবছর সারা বিশ্বে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস'। কন্যাশিশুর প্রতি জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য রোধে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু বিকাশের বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১১ সালের কন্যাশিশুদের শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আইনি সহায়তা ও ন্যায্য অধিকার, চিকিৎসা, বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে এ দিবসের সূচনা হয়। সারা বিশ্বে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে ২০১২ সালের ১১ই অক্টোবর থেকে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। কানাডায় প্রথম জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরের বছর ২০১২ সালের ১১ই অক্টোবর প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস'।

বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। মধ্যম আয়ের দেশের জন্য দরকার একটি সুস্থ, সবল, শক্তিশালী, দক্ষ, প্রশিক্ষিত এবং চৌকস কর্মশক্তির সমন্বিত প্রয়াস। যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ আবশ্যক। আজ যোগ্যতার সঙ্গে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা বিশ্ব রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে সমান ভূমিকা রাখছে। মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষে আজ নারী পুরুষের বিভেদ, হীনমন্যতা সমাজ থেকে কমেছে ঠিকই কিন্তু সমাজ এখনও পুরোপুরি ছেলেমেয়েদের সমান অধিকার সমভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না– কন্যাশিশুদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে হবে আমাদেরকেই।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ ১৮ বছররে কম বয়সি শিশু এবং এদের মধ্যে ৪৮ শতাংশই কন্যাশিশু। শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় বিভিন্ন র্কমসূচি পালন করা হচ্ছে। সচেতনতামূলক প্রচার আর আইন করেও বাল্যবিয়ে বন্ধ করা যাচ্ছে না। দেশের অধিকাংশ কন্যাশিশুর বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের আগেই। এই কন্যাশিশুরা নানাদিক দিয়ে অবহেলিত। উচ্চবিত্ত পরিবারই হোক বা নিম্নবিত্ত কোথাও কন্যাশিশুরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, এমনকি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কন্যাশিশুরাও সমাজে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ইউনিসেফের তথ্যমতে, শিশুবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী শতকরা ৬৬ ভাগ কন্যাশিশুর ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর তথ্য অনুসারে ১০ বছর বয়সি কন্যাশিশুদের অনেক বেশি বয়সি পুরুষের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। প্ল্যান বাংলাদেশ-এর সমীক্ষা মতে পারিবারিক সহিংসতার কারণে ১৩ থেকে ১৮ বছরের গৃহবধূ ও মেয়েদের শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি মারাত্মক শারীরিক আঘাতে মৃত্যুও হয়ে থাকে। এছাড়া এসিড, সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনায় দেশের কন্যাশিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রণীত আইন উল্লেখ করা যেতে পারে। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রণীত হয়েছে শিশু আইন ১৯৭৪। সব শিশুকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রণয়ন করেছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ২০১০। এটি শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বির্নিমাণে সুদূরপ্রসারী রূপকল্প। এছাড়াও শিশু অধিকার রক্ষায় প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০, জাতীয় শিশুশ্রম নীতিমালা ২০১০, বাংলাদেশ জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং শিশু অধিকার আইন ২০১৩।

সরকার বিগত বছরগুলোতে কন্যাশিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য নানাবিধ নারীবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলসমূহে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা কন্যাশিশুর উন্নয়ন, বাল্যবিবাহরোধ এবং শিশুমৃত্যুর হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, কন্যাশিশুদের ছেলেসন্তান থেকে আলাদা নয়, বোঝা নয় বরং মানুষ করার, সুশিক্ষিত করার প্রত্যয় ধারণ করতে হবে। কন্যাশিশুর সম-অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি পরিবার থেকেই নিশ্চিত করতে হবে। মা-বাবাকেই এই কাজটি প্রথমে করতে হবে। কন্যাশিশু ও নারীদের অধিকার অর্জিত হলে মানবসম্পদ উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যাবে। পরিবার,

সমাজ, রাষ্ট্র সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে নারীর উন্নয়ন আবশ্যক কারণ আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের একজন প্রতিষ্ঠিত মহীয়সী নারী হবে– এমন স্বপ্ন এখন আর দুঃস্বপ্ন নয় কোনোভাবেই।

বাংলাদেশ সরকার কন্যাশিশুদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে যথাযথ গুরুত্বসহকারে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তাবায়ন করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে একটু বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যাতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে ছেলে ও মেয়েদের অনুপাত সমান থাকে। এই বাড়তি সুযোগ নিয়ে কিছু মহল নানান কথা বলেন, তবে এটা তাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার না দিলে সমতা আনা অসম্ভব। তাই সমতা সৃষ্টির জন্য সোচ্চার হয়ে যা যা করণীয় তাই করে যেতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় বাজেটের ২ শতাংশ শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখে যা কন্যা ও পুত্র সকল শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। তবে সমতা বিধানের লক্ষ্যে সরকার কন্যাশিশুদের জন্য নিয়মিত স্কুল, নিরাপত্তা, স্যানিটারি ব্যবস্থা, খেলাধুলার সুযোগ, হেল্পলাইন, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, মাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে।

কন্যাশিশুদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবকদের সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হতে হবে। একটা সময় ছিল যখন পরিবার থেকেই কন্যাসন্তানদের অবহেলার শুরু হতো, যদিও বর্তমানে এর পরিমাণ কমেছে, তবে একেবারেই যে পরিবার থেকে মেয়েরা অবহেলিত হচ্ছে না তা বলা যাবে না। প্রচলিত একটি কথা আছে, 'যে সন্তানকে তার মা আদর করে না, সে সন্তান অন্য কারোর আদরও পায় না।' তাই যতদিন একটি মেয়ে তার পরিবারে যথোপযুক্ত সম্মান পাবে না, ততদিন সে অন্য কোথাও উপযুক্ত সম্মান পাবে না। সবার আগে অভিভাবকদের এই বিষয়টি থেকে বেরিয়ে কন্যা-পুত্র উভয়ের মধ্যে সমতা আনতে হবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন প্রতিটি মৌলিক অধিকারের বেলায় সমতা আনা জাতীয় উন্নতির জন্য খুবই যুক্তিযুক্ত।

কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সমাজের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। পরিবার থেকেই এই ভূমিকার শুরু। একটি মেয়েশিশুকে জন্মের পর থেকে তার পোশাক, চলাফেরা, আচার-আচরণে যে শিক্ষা পরিবার থেকে দেওয়া হয় সমহারে একই শিক্ষা পুত্রদেরও দেওয়া উচিত। মেয়েদেরকে অতিরিক্ত সতর্ক হতে না শিখিয়ে ছেলেদেরকে এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা মেয়েদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয় যেমনটি ছেলেরা মেয়েদের থেকে পায়। পরিবার থেকে ছেলেরা চাইলেই যে-কোনো জায়গায় যাওয়ার অনুমতি যেভাবে পায়, মেয়েরা তা পায় না। কারণ, অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকে। এই যে নিরাপত্তার অভাব। মেয়েদের যেন নিরাপত্তার অভাব না হয়, ছেলেদেরকেও এমনভাবে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া উচিত, কেননা মেয়েদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় বিপথগামী-পুরুষদের থেকে। এজন্য রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ এবং সর্বস্তরের নারী-পুরুষ সবাইকেই মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসতে হবে, তবেই আমার-আপনার কন্যা সুরক্ষিত থাকবে।

কন্যা ও পুত্র উভয়ের অধিকারে সমতা না আনা পর্যন্ত দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার এই সমতা আনয়নের ব্যাপারে যত কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে সেগুলোতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাস্তবায়নে একাত্ম হওয়া খুব জরুরি। তাছাড়া ব্যক্তি উদ্যোগেও পরিবারেই সকল বিষয়ে সমতা আনয়নের ব্যাপারে জোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই কন্যাশিশুরা হবে নিরাপদ আর আমরা উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারব।

হাছিনা আক্তার: সিনিয়র সম্পাদক (সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, akterhasina90@gmail.com

বাংলাদেশ পর্যটনে রোল মডেল

কাদের বাবু

রূপবৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। রূপে-গুণে অনন্য এই দেশের পর্যটন খাত বাংলাদেশের জন্য অপরিসীম আয়ের উৎস। সেটা বুঝতে পেরে বর্তমান সরকার পর্যটন বিকাশে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপের আধার পার্বত্য অঞ্চলের অস্থিতিশীল অবস্থার পরিবর্তন আনতে পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে পাহাড়ে শান্তির বার্তা বইতে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাহাড়ে ভ্রমণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে ভ্রমণপিপাসুরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করতে পারেন। দেশের অন্যতম আয়ের খাত হচ্ছে পর্যটনশিল্প। শুধু পাহাড়ি এলাকায়ই নয়, দেশের নয়নাভিরাম সকল দৃশ্য উপভোগ করার জন্য সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পর্যটন খাতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পর্যটনের সাথে যুক্ত সংস্থাসমূহের নৈমিত্তিক কর্মপরিকল্পনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপত্তা, সংস্কৃতি, বাসস্থান, বন্দর ও বিমান পরিবহণ অবকাঠামো, আর্থিক মান ও স্থিতিশীল ভ্রমণের সুযোগসহ ৯০টি মানদণ্ড বিবেচনা করে ১৪০টি দেশের র‍্যাংকিং করা হয়েছে একটি প্রতিবেদন। এতে পর্যটন খাতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১২০তম। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুবাদে বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবছর প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ লাখ পর্যটক দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ভ্রমণ করে থাকেন। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণে আগ্রহ বাড়ার কারণে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে পর্যটন খাতে সরাসরি কর্মরত আছেন প্রায় ১৫ লাখ মানুষ। এছাড়া পরোক্ষভাবে কর্মরত আছেন ২৩ লাখ মানুষ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা।

পর্যটনের অপার সম্ভাবনার নাম বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল। পার্বত্য অঞ্চল তিনটি জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটনের মূল উপকরণ হলো পাহাড়ে ঘেরা সবুজ প্রকৃতি– যা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পর্যটকদের কাছে ধরা দেয়। এখানে শীতে যেমন এক রূপ ধরা দেয় ভ্রমণপিপাসুদের কাছে, ঠিক তেমনি বর্ষা অন্য এক রূপে হাজির হয়। শীতে পাহাড় কুয়াশা আর মেঘের চাদরে যেমন ঢাকা থাকে, তার সঙ্গে থাকে সোনালি রোদের মিষ্টি আভা। আবার বর্ষায় চারদিক জেগে ওঠে সবুজের সমারোহ। এসময় প্রকৃতি ফিরে পায় আরেক নতুন যৌবন। বর্ষায় মূলত অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিস্টদের পদচারণা সবচেয়ে বেশি থাকে এ পার্বত্য অঞ্চলে। তখন এখানে ঝরনা, হ্রদ কিংবা নদীপথগুলো নতুন রূপে সেজে ওঠে– যা দেখার জন্য অসংখ্য পর্যটক এখানে ভিড় করেন। এর সঙ্গে আছে পাহাড়ের মানুষের ভিন্নধর্মী জীবনাচরণ– যা আমাদের চেয়ে অনেকটা আলাদা।

নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল। এ শহরে রয়েছে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ চা বাগান–যা মালনিছড়া চা বাগান নামে পরিচিত। এ অঞ্চলে আসা পর্যটকদের মন জুড়ায় সৌন্দর্যের রানি খ্যাত জাফলং, নীলনদ খ্যাত স্বচ্ছ জলরাশির লালাখাল অপরূপ সৌন্দর্য, পাথর জলের মিতালিতে বয়ে যাওয়া বিছানাকান্দির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, পাহাড় ভেদ

করে নেমে আসা পাংথুমাই ঝরনা, সোয়াম্প ফরেস্ট রাতারগুল, মিনি কক্সবাজার হাকালুকি এবং কানাইঘাটের লোভাছড়ার সৌন্দর্য।

বাংলাদেশের হাওর জেলাসমূহ পর্যটনের আরেক সম্ভাবনার নাম। জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে– সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া– এ সাতটি জেলার ৭ লাখ ৮৪ হাজার হেক্টর জলাভূমিতে ৪২৩টি হাওর নিয়ে হাওরাঞ্চল গঠিত। হাওর অঞ্চলের সাগরসদৃশ বিস্তীর্ণ জলরাশি এক অপরূপ মহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাওরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকরা নৌকায় বসে বিস্তীর্ণ নীল জলরাশির মায়ায় ভেসে বেড়াতে পারেন। হাওরের কোলঘেঁষে থাকা সীমান্ত নদী, পাহাড়, পাহাড়ি ঝরনা, হাওর-বাঁওড়ের হিজল, করচ, নল, খাগড়া বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নানা প্রজাতির বনজ, জলজপ্রাণী আর হাওর পাড়ের বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকার নানাচিত্র পর্যটক ও দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করবে।

বর্তমান সরকার পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে দিনাজপুর, কুয়াকাটা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, রাঙামাটি, সিলেটের জাফলং ও চট্টগ্রামে পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন ও সংস্থার সকল ইউনিটকে ডিজিটাইজ করতে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। কুয়াকাটায় পর্যটন মোটেল ও ইয়ুথ ইন নির্মাণ; কিশোরগঞ্জ জেলার মসুয়ায় অবস্থিত সত্যজিৎ রায়ের জমিদার বাড়িতে পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন; চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদ এলাকায় পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণ; রাজশাহী জেলার পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন; রংপুর জেলার পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন; দিনাজপুর জেলার পর্যটন মোটেল-এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন; দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দিরের সন্নিকটে পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে। আগারগাঁওয়ের শেরেবাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। সিলেটের জাফলং-এ পর্যটন সুবিধা বাড়াতে ৪টি আবাসিক কক্ষ; ৫০০ আসনবিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ২টি ওয়াশ রুম নির্মাণ; রাঙামাটিতে নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ; চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের স্থলে নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ; দেশের ২৮টি স্থানে পর্যটন সুবিধা নির্মাণ/উন্নয়নসহ সাইনেজ স্থাপন করা হচ্ছে। পর্যটনকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠন; বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের সকল বাণিজ্যিক ইউনিট ডিজিটাল সিস্টেম/অটোমেশন-এর আওতায় আনা হয়েছে। অনলাইন রিজারভেশন পদ্ধতি চালু, এনএইচটিটিআই-এর অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া চালু, ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতির প্রবর্তন ও ব্যাবসা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রিভিলেজ কার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন ২০১০ প্রণয়ন; বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠন এবং ১লা সেপ্টেম্বর ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাপক প্রচার ও বিপণনের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। লালমনিরহাট জেলার তিস্তা ব্যারেজ এলাকায় পিকনিক শেড তৈরি করা হয়েছে। কুষ্টিয়ায় লালন একাডেমিতে পর্যটকদের জন্য ভৌত সুবিধা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বান্দরবান জেলায় পর্যটন স্থানে সহজে গমনের জন্য সিগনেস স্থাপন করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় অবস্থিত লাঙলবন্দ তীর্থস্থান সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি পবিত্র ধর্মক্ষেত্র তথা ঐতিহ্যবাহী পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র বিবেচনা করে তীর্থস্থানের ঘাট ও অন্যান্য স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। পর্যটন সম্পর্কিত খবরাখবর ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের একটি নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস তৈরি; স্যোশাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণের নিকট দেশের পর্যটন শিল্পের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গন্তব্য ও পর্যটন আকর্ষণ নিয়ে নিয়মিত ই-নিউজ লেটার প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন ই-মেইল অ্যাড্রেসে এসব ই-নিউজ লেটার

পাঠানো হয়। ১২৫ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা; হসপিটালিটি পেশায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ৫৫২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান; ১০টি পাঁচ তারকা, ৩টি চার তারকা ও ১০টি তিন তারকা মানের হোটেলের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আগের রূপসী বাংলা হোটেলের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে। রূপসী বাংলা হোটেলের নতুন নামকরণ করা হয় ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল। ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্‌বোধন করেন। এ হোটেলের কক্ষসমূহের আধুনিকায়নের কাজ সম্পন করা হয় এবং এর ফলে হোটেলটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন ২০১০ প্রণয়ন, বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন, বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন, বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন ২০১৪ প্রণয়ন, বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন, বাংলাদেশ ট্র্যাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ প্রণয়ন, বাংলাদেশ ট্র্যাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৪ প্রণয়ন এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমাদের কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্রসৈকত, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকতটি কোথাও কাদার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত পর্যটন খাতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর রয়েছে অপার সম্ভাবনা। বর্তমান সরকারের কক্সবাজার নিয়ে রয়েছে নানা পরিকল্পনা। সম্প্রতি কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সাগর পাড়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে পর্যটন নগরী হিসেবে গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার রেল সম্প্রসারণ দেশের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। একইসঙ্গে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। ফলে খুব সহজে বিশ্বের পর্যটক বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটন আকর্ষণে কক্সবাজারে আরও বেশি পরিমাণে আসবে। এখানে তিনটি পর্যটন পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এগুলো নির্মাণ করা হলে ২০০ কোটি ডলার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ তিনটি ট্যুরিজম পার্ক হলো– সাবরাং ট্যুরিজম, নাফ ট্যুরিজম পার্ক এবং সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক। পৃথিবীর বড়ো ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের মোট বনভূমির ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশ অংশে। বাকি অংশ ভারতে। সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেসকোর ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্য যে-কোনো পর্যটন কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র রূপে উপস্থাপন করেছে। সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, খাল, শত শত শাখানদী, কাদা চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপমালা। সুন্দরবন নামের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বনভূমিটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানা ধরনের পাখি, চিত্রা হরিণ, কুমির, ডলফিন ও সাপসহ অসংখ্য প্রাণীর আবাসস্থল।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সংবিধি ১৯৭০ সালে পাস করা হয় এবং তার দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর এ সংবিধি কার্যকর হয়। সংবিধি কার্যকর করার দিন থেকেই বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিবসটি পালন করে আসছে। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য 'অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য পর্যটন'।

পর্যটন একটি বহুমুখী শিল্প। প্রায় ৭০ ধরনের প্রতিষ্ঠান সরাসরি পর্যটকদের সেবা দিয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে দু'চারটি ছাড়া বাকি সবগুলো প্রতিষ্ঠানই ছোটো আয়তনের এবং স্বল্পপুঁজির। ফলে এদের পক্ষে গণমাধ্যমে প্রমোশন কার্যক্রম চালানোর ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয় না। ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন এসব প্রতিষ্ঠানের প্রমোশন কার্যক্রমকে সহজ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার অভীষ্ট লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন রূপকল্প-২০২১। দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত রেখে জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণসহ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে ১৯৭২ সালে গঠন করেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নের অগ্রপথিক। সরকারি এ সংস্থাটি বেসরকারি অংশীজনসহ দেশের পর্যটন উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে।

কাদের বাবু: শিশুসাহিত্যিক ও কবি, সম্পাদক ও প্রকাশক, বাবুই, babuiprokash@gmail.com

পিতার স্বপ্ন ছুঁয়ে ছুঁয়ে

কাজী কেয়া

রাত কি অনেক হলো? জলপাখিরা উড়ছে। ওরা ঝাঁক বেঁধে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওদের ডানার শব্দে পদ্মার জল আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাঝরাতের নদী ঢেউ ঢেউ খেলছে। আলো ঝিলকে উঠছে। চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতা ঘাটের মোমগলা আলোর সাথে মিশে কেমন এক অলৌকিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। স্রোতস্বিনী নদী পদ্মা স্বপ্ন দেখছে, নাকি ঘোরের মধ্যে এসব স্বাপ্নিক আবেশে সে দুলে উঠছে, ফুলে ফুলে উঠছে। হয়ত স্বপ্ন নয়, কারণ এ তো বাস্তবের প্রতিচ্ছবিই, অন্তত আজকের রাতের জন্য। জলের মুকুরে জাতির পিতার স্বপ্নের রুপালি সেতুটা হেসে উঠেছে। প্রতিরাতেই এমন হয়, তবে আজ একেবারে অন্যরকম। আজ সেতুটা নানারঙে, নানা আলোয় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চাঁদ চেয়ে আছে অবাক চোখে। এত সুন্দর, এত আলোকোজ্জ্বল স্থাপনা সে দেখেনি আগে। আজ কেন এত অপরূপ হয়ে উঠল সেতুটা? প্রতিদিনই চাঁদ সেতুটার ওপর আলো ফেলে, তখন চাঁদ নিজেকেই সেরা ভাবে। ভাবে, সেতুটাকে সে তার বিভায় আরও সুন্দর করে তুলেছে। কিন্তু আজ সেতুর সৌন্দর্যের কাছে চাঁদ অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। কেন? আজ বিশেষ কোনো দিন কি? ভাবতে থাকে চাঁদ। হঠাৎ একটা গাঙচিল সাদা ঘুড়ির মতো বাতাসে ডানা ছেড়ে সেতুর ওপর ভাসতে ভাসতে চি-চি করে বারকয়েক ডাকল। ডাকল, নাকি কিছু বলল সে! পাখির ভাষা কি চাঁদ বোঝে? হয়ত বোঝে। চাঁদ বুঝে গেল ব্যাপারটা। হুম, আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর। বিশেষ দিনই তো! বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা, বিশ্বমানব শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠকন্যার জন্মদিন।

জ্যেষ্ঠকন্যা বলে কথা! তাছাড়া জ্যেষ্ঠকন্যাটা শুধু সন্তানদের মধ্যে সবার বড়ো বলেই নয়, পিতার যোগ্যসন্তানও তিনি। চাঁদ একথা ভেবে কিছুটা ম্লান হয়ে গেল। চাঁদের ম্লান আলোয় নদীও যেন হঠাৎ কেমন থমকে পড়ল। নিস্তরঙ্গ হয়ে উঠল। জলপাখিদের কোলাহলও যেন হঠাৎ মৃদুতর হয়ে উঠল। হ্যাঁ, চাঁদের দুঃখ নদী টের পেল। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫-এর সেই শোকার্ত রাতের কথা মনে পড়ল চাঁদের। আহা, কী অদ্ভুত সেই মনুষ্য ঘাতকেরা। কী জঘন্য ওরা! ওরা ছিল শত শত বছরের অধীনতার গ্লানিতে নিমজ্জিত। সেই কষ্টকর জীবন থেকে যে মহান মানুষটি ওদেরকে স্বাধীনতার সুবর্ণ তটে টেনে তুলল, সহস্র জীবনের বঞ্চনা থেকে মুক্ত করল, দিলো একটা আপন দেশ, প্রাণের পতাকা, গৌরবদীপ্ত

মানচিত্র– তাঁকেই কি না হত্যা করল সেই স্বজাতীয় কুলাঙ্গাররা। ইশ! আর ভাবতে পারে না চাঁদ! বিশ্রি ঘাতকেরা জাতির পিতাকে হত্যা করেই থেমে থাকল না। একে একে হত্যা করল মমতাময়ী মাকে– যে মা জাতির পিতার অবর্তমানে দুঃসহ সেই একাত্তরের যুদ্ধদিনে জাতিকে আগলে রেখেছিল সাহস ও ছায়া দিয়ে। তারা হত্যা করল তাঁর তিন সুন্দর পুত্রসন্তানকে। আহা! সবার ছোটো, নিষ্পাপ প্রসূনের মতো শিশু রাসেলকে হত্যা করতে ওদের পাপিষ্ঠ হাত একটুও কাঁপলো না।

ওরা পিতার স্বজনদের, প্রিয়জনদেরও একে একে হত্যা করল। ওরা ভেবেছিল, পিতার বংশের সবাইকে শেষ করলে আর কখনোই এদেশকে শাসন করার মতো ওদের কেউ থাকবে না। অনায়াসেই হাজার বছর ধরে দেশটাকে আবার তাদের পুরনো রাষ্ট্রের আদলে শাসন করবে তারা। বস্তুত, ওরা স্বাধীনতার মর্ম বোঝেনি। ফলে একাত্তরের পরাজিত শক্তির দোসর হয়ে ওরা এই শোকাবহ ঘটনা ঘটালো। চাঁদ বেদনার মধ্যেও যেন একটু হাসল। তার হাসির আলোয় রুপালি সেতুটা একটুখানি আগের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল। চাঁদ হাসল এই ভেবে যে, ঘাতকরা সত্যিই বোকা। তারা অদূরদর্শী এবং প্রকৃত অর্থেই আহাম্মক। ওরা হত্যা করতে পারেনি শুধু জাতির পিতার দুই কন্যাকে। তারা তখন দৈবক্রমে দেশের বাইরে ছিল বিধায়। অবশ্য ওরা দেশের বাইরের সেই কন্যাদ্বয়ের খবর রাখত গুপ্তচরের মাধ্যমে। হত্যা করার চেষ্টাও হয়ত করেছে। হয়ত এও ভেবেছে– ওরা মেয়ে। ওদের কোনো ক্ষমতাই নেই তাঁর পিতার প্রিয় দেশটাকে আবারো আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনার। কিন্তু ওদের ভাবনা নিছক আনাড়ি ছিল। আজ পিতার সেই জ্যেষ্ঠকন্যাটির জন্যই দেরিতে হলেও দেশ রক্ষা পেয়েছে। পিতার যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা। পিতার স্বপ্ন ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায়। এইতো এই সেতু। উত্তাল পদ্মাকে বশে এনে এপার-ওপার বেঁধে রাখা স্বপ্নের মেলবন্ধন পদ্মা সেতু।

চাঁদ এবার সবটুকু আলো ছড়িয়ে হেসে উঠল। সোনালি আলোর বিচ্ছুরণ সেতু উপচে পদ্মার উল্লসিত ঊর্মিমালাকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলল। ঠিক সে মুহূর্তেই এক প্রলম্বিত ছায়া পড়ল সেতুর ওপর। কার ছায়া? একেবারে জীবন্ত ছায়া! এপার-ওপারব্যাপী প্রলম্বিত ছায়া। চাঁদ নিজেকে কিছুটা লুকিয়ে নিল মেঘের ভাঁজে। সে সেতুর ওপর থেকে নিজের আলোটা সরিয়ে নিল কিছু একটা বোঝার জন্য। চাঁদ কিন্তু দেখতে পেল সব। একটা মানুষ। দীর্ঘ ঋজু অবয়বের মহামানুষ এক। সেতুর ওপাশ থেকে হেঁটে ঋজুভঙ্গিতে এপাশে হেঁটে চলেছেন। এত বিস্তৃত সেতুও যেন তাঁর দীর্ঘ অবয়বের ছায়া ধরে রাখতে পারছে না। পদ্মার উত্তাল ঢেউ তাঁর আগমনে কলস্বর তুলে শতগুণ আবেগে দুলতে লাগল। তিনি হাঁটছেন ধীর অথচ দৃপ্ত পদক্ষেপে। মুখে তাঁর স্মিত হাসি। সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবি আর গায়ে সেই চিরচেনা হাতাকাটা কালো কোট। চাঁদ সহজেই চিনে ফেলল মানুষটাকে। তিনি সেতুর রেলিং ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটছেন। কখনো একটু থেমে রেলিংয়ে হাত বুলাচ্ছেন। চাঁদ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এবং সে শুনতেও পেল একবার– আজ আমার হাসুর জন্মদিন!...

চাঁদ শুনছে মেঘের আড়ালে কান পেতে– আমার স্বপ্ন, অনেক স্বপ্নের মধ্যে বড়ো স্বপ্নই তো ছিল এই পদ্মা সেতু। আহা, আমার কন্যা! আমার আদরের হাসুই আমার সেই স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলল।

তখন জলপাখিদের ডাক আর ডানার শব্দ দুপাড় মুখরিত করে তুলল। তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। চাঁদ আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে আরও ভালো করে তাঁকে দেখতে লাগল। এখন তিনি সেতুর মাঝখানে। এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর অবয়ব। আরও উজ্জ্বল। আরও দীর্ঘদেহী মনে হচ্ছে তাঁকে।

মনে পড়ল চাঁদের, সেই আততায়ী রাতের কথা। যখন দরজা খুলে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ভীরু কাপুরুষ ঘাতকদের তিনি বললেন, কী চাস তোরা? তখন ওদের সর্দারগোছের অস্ত্রধারীটা কেমন যেন থতোমতো খেয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তেই ওদের আরেকজন এতই ভীত হয়ে পড়ল যে, সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হাতে অস্ত্রের ট্রিগারে এমন চাপ দিলো যে, মুহূর্তেই সবগুলো বুলেট বেরিয়ে এল। সোজা পিতার প্রশস্ত বুকে আঘাত করল সেগুলো। পিতার দীর্ঘদেহ সিঁড়িতে এলিয়ে পড়ার পরও ওদের বিশ্বাস হচ্ছিল না তিনি এখন নিষ্প্রাণ! নিজেদের প্রতি এই অবিশ্বাসের কারণেই কয়েকজন ঘাতক তাদের সবগুলো অস্ত্রের বুলেটই পিতার বুক লক্ষ্য করে নিঃশেষ করল। একথা মনে পড়লে চাঁদ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং সেতুর ঠিক মাঝখানে আলো ছড়িয়ে দিলো। এরপর চাঁদ মেঘের ভাঁজ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসে আরও স্পষ্ট করে দেখতে থাকল বাংলার জাতির পিতাকে। ঠিক তাঁর মোটা কালো ফ্রেমের চশমার ওপর চাঁদ আলো ফেলল এবার। অবাক চাঁদ– তার আলোর চেয়েও উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ তাঁর প্রদীপ্ত চোখ দুটি।

'সময় হয়ে এল। আর সামান্য ক্ষণ, তারপর বিদায় নিতে হবে।'– ভোরের আবেশ লক্ষ করে চাঁদ শেষবার তার আলো ছড়াতেই দেখল তিনি প্রায় পৌঁছে গেছেন সেতুর অপর প্রান্তে। চাঁদ শুনতে পেল সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বাড়িয়ে দিয়ে ডানহাতটা দুলিয়ে কেমন স্মিত মায়াবী কণ্ঠে বললেন, হাসু, হাসুমা আমার, ভালো থাকিস। আমি আমার স্বপ্ন ছুঁয়ে গেলাম।...

হঠাৎ চাঁদ ডুবে গেল। এরপর নরম ভোর কেমন স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে তুলল চারদিক। ভোরের পদ্মা মোহনায় জাগরণ তুলে প্রতিদিনের মতো বয়ে চলল। কেউ জানলো না গত রাতে কী ঘটে গেল। হয়ত তা স্বপ্নই, কিংবা সত্যিই হয়ত।

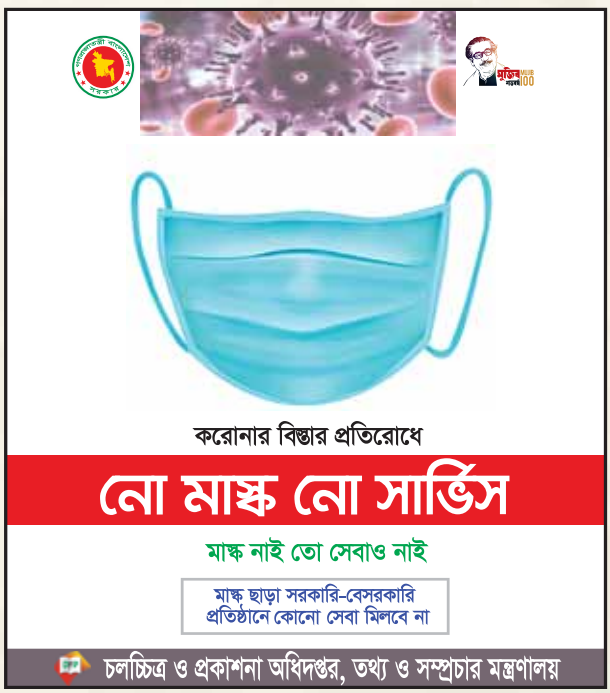

জাতির পিতার কন্যা তুমি

ফারুক নওয়াজ

জাতির পিতার কন্যা তুমি ধন্য পরিচয়–
এসেই তুমি স্বাধীন জাতির কাটালে সংশয়।
স্বদেশ যখন জনকহারা উলটপালট সব–
চতুর্দিকে চলছে যখন দুঃসহ মচ্ছব–
আকাশ যখন থমকে গেছে, কালচে কালো মেঘ–
বাতাসজুড়ে বিলাপগাথা অজানা উদ্বেগ–
স্বাধীন জাতি আবার যেন অধীন হয়ে যায়–
মানুষ যখন গুমরে মরে এমন আশঙ্কায়–
ঠিক তখনি আস্‌লে ফিরে সিক্তচোখে তুমি;
তোমায় পেয়ে দুঃখ চেপে হাসলো স্বদেশভূমি।
শত্রুগুলো তাল হারিয়ে নাশকতায় মাতে
দেশ বাঁচাতে নামলে তুমি জীবন নিয়ে হাতে।
গ্রেনেড-বোমায় প্রাণটা তোমার কাড়তে গিয়ে শেষে
শত্রুগুলো রক্তনদী বইয়ে দিলো দেশে।

জাতির পিতার কন্যা তুমি জাতির অহংকার
তুমি তুমিই– তোমার সাথে হয় তুলনা কার?
ভস্ম হওয়া দেশকে আবার সাজিয়ে দিলে তুমি
দিনবদলের প্রত্যয়ে আজ দীপ্ত জন্মভূমি।
খেলাধুলা, শিক্ষা, সেবা, প্রযুক্তি, বিজ্ঞানে...
স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতি– উন্নতি সবখানে।
দেশের মানুষ মঙ্গা-খরায় থাকে না না-খেয়ে;
ধন্য জাতি তোমার মতো এমন নেত্রী পেয়ে!
বিশ্বজুড়ে তোমার সুনাম তোমার গুণের গাথা–
তোমার জন্য আজকে জাতি উঁচিয়ে রাখে মাথা।

দেশরত্ন শেখ হাসিনা... বিশ্বময়ী তুমি–
তোমায় পেয়ে ধন্য জাতি, ধন্য স্বদেশভূমি!
দীর্ঘজীবী হও তুমি– আজ এই শুধু প্রত্যাশা–
তোমার জন্য ষোড়শ কোটি বুকের ভালোবাসা।
শুভ শুভ শুভ তোমার জন্মদিনের ভোরে...
স্বদেশ মাতুক পাখির গানে, নদীর কলস্বরে।

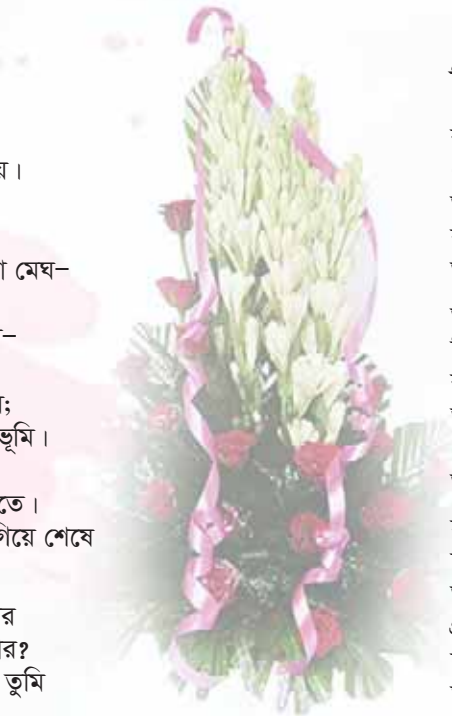

আলোকবর্তিকা

শিরিন আক্তার

রত্নগর্ভা জননীর গর্ভকোষে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ করে
জন্মেছিলেন এক আলোকবর্তিকা–
আলোকিত করেছিলেন মায়ের কোল,
ধন্য বরেণ্য পিতা নিজ হাতে গড়েছিলেন তাঁকে।
বাবা-মায়ের আদর্শে লালিত এই আলোকবর্তিকা,
যিনি আলোকিত হয়েছেন বিশ্বময়!
বিশ্বের মানচিত্রে আলোর মশালের ন্যায় তুলে ধরেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ।
বাবার স্বপ্ন ও মায়ের আদর্শ পূরণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই আলোকবর্তিকা–
যুগে যুগে স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করবে একটি নাম– শেখ হাসিনা।

এক স্বপ্নকন্যার জন্মদিনে

মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন

রক্তের মেহেদি পরে জেগে উঠেছিল
এক স্বপ্নকন্যা। আহা কত কিছু হারিয়ে
অশ্রুভেজা চোখে, ঠোঁটে হাসির ঝলক
বুকভরা আগুন– তবু রুপোলি জোছনা
অবশেষে ঘরে এল ভালোবাসা নিয়ে।

আলতা পরা জমিন শোকবৃষ্টিতে ধুয়ে
দিগন্ত প্রসারী সবুজের চাষ শুরু হলো।
রাখাল রাজার হাতে জাদুর জীয়ন কাঠি
ভাঙা ঘরগুলো আর যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষ
ভোরের আলোয় জেগে উঠতে উঠতেই
আবার অন্ধকার ঢেকে দিলো আকাশ।

হায় হতভাগী স্বপ্নকন্যা কপালভাঙা
দুঃখ নিয়ে দীর্ঘ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলো।
অতঃপর যোজন যোজন অন্ধকার তাকে
গ্রাস করে নেয়। অবশেষে রাখাল রাজার
দুহিতা আঁচল পেতে দাঁড়ালো সমুদ্রতীরে
তারপর এই তো ঘুমভাঙা সকাল
কাঁচা রোদের হাসি– স্বপ্ন বালিকার
স্বপ্নচোখের স্বপ্নে বিভোর আমার বঙ্গভূমি–
এখানে আর অন্ধকার ছড়িও না শকুন।

জন্মদিবস পেয়ে

গোলাম নবী পান্না

এ দেশের প্রতি যাঁর মমতাটা মাখা
সবকিছু ঊর্ধ্বেই দেশটাকে রাখা।

তাই তিনি জনগণ সাথে নিয়ে বেশ–
গড়ে যান স্বপ্নের প্রিয় এ স্বদেশ।

শত বাধা পেরিয়েই এগিয়েই যান
হাল ধরে, পাল তুলে তীর খুঁজে পান।

এই তরী নিয়ে তাঁর গতি ফিরে আসে
চলমান রাখতেই জনগণও পাশে।

জনগণ পাশে থেকে নেত্রীকে নিয়ে–
সফলতা খুঁজে নেন প্রেরণাটা দিয়ে।

'শেখ হাসিনা'ও তাই হাসিমুখে সেই–
উৎসাহে গড়ে যান প্রিয় দেশকেই।

এভাবেই পরিচিতি বিশ্বের কাছে
বাংলাদেশের হয়ে খ্যাতিটিও আছে।

জন্মদিবস পেয়ে আমরাও তাই–
দীর্ঘ জীবন তাঁর এইটুকু চাই।

কবিকন্যা

মোহাম্মদ আলী খান

একটি মধুর স্বপ্ন কবিতার মহাসড়ক পেরিয়ে
মিষ্টি ফুল হয়ে ভোরের পাখির রোমাঞ্চিত গান হয়ে
রক্তের বর্ণিল উত্তরাধিকার উড়িয়েছিল পতাকা,
মধুমতী তীরে নিপুণ শিল্পীর আঁকা
একটি মায়াবী ছবি বৃষ্টিভেজা সবুজ ঘাসের বুকে
পথ চলেছিল স্বপ্নের আবীর মেখে।

শাড়ির আঁচলে তাঁর রক্তেভেজা একুশের বর্ণমালা
কণ্ঠে তাঁর জাতির পিতার শাণিত, স্পন্দিত শব্দমালা।

বহমান নদী আঁকাবাঁকা পথে উত্তাল কল্লোলে
নিয়ে যায় আজ মোহনার পানে জন্মদিনের সকালে,
এক বিন্দু
হয়ে যায় আজ মহাসিন্ধু,
স্বপ্নীল দেশের পতাকা পলল মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে
শোভা পায় দেশ-মহাদেশ মহাসাগরের তীরে তীরে।

শেখ হাসিনা

আবুল হোসেন আজাদ

মধুমতী নদীতীরে
অজপাড়া এক গ্রাম
গোপালগঞ্জের সবুজ-শ্যামল
টুঙ্গিপাড়া নাম।

এই গ্রামের শেখ পরিবার
বনেদি যে ঘর,
কৃষক-জেলে বাস করে সব
মিলে পরস্পর।

শেখের ঘরে জন্ম নিলেন
ফুটফুটে এক কন্যা,
আদরিণী চোখ জুড়ানো
রূপে সে অনন্যা।

এই শিশুটি শেখ হাসিনা
জাতির পিতার মেয়ে,
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
জনগণের নেয়ে।

সেপ্টেম্বরে আঠাশে তাঁর
শুভ জন্মদিনে,
ভালোবাসার সুর যে বাজে
হৃদয়ের গহিনে।

একটি কন্যা, শেখ হাসিনা

শিল্পী ভদ্র দীপিকা

একটি কন্যা, শেখ হাসিনা হলে,
পিতার নাম ছড়াতো বিশ্বাকাশে।

পিতার অপূর্ণ কাজে,
পূর্ণতার প্রত্যয়ে,
দৃঢ় পদক্ষেপে যেত এগিয়ে।

শুনতো অলক্ষ্যে,
পিতার আশীর্বাণী–
ভয় নেই মা, এগিয়ে যা,
সাহস রাখ, আমি আছি ।

মাকে করতো রত্নগর্ভা,
মাতার আদর্শ, ত্যাগ, বুদ্ধিমত্তা,
সর্বজনে জানাতো;
যে কথা ছিল,
সকলের অজ্ঞাত।

কবিগুরুর 'সোনার বাংলা'
গড়বো একদিন আমরা।
বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন এঁকেছিল হৃদয়ে।

সে স্বপ্ন-সারথি হয়ে
শেখ হাসিনা দেশ গড়তে,
চলেছে সমুখপানে।

তাঁর অগ্রযাত্রার পথে,
শুভ জন্মদিনে,
শুভেচ্ছা শুভ অভিবাদনে।

মায়ের মতো উজ্জ্বল বোন

কামাল বারি

সৌভাগ্যের মতো সবুজ সুন্দর মুখ;
আমাদের মায়ের মতো উজ্জ্বল বোন;
থরেবিথরে সাজানো ফসলের হাসি;
পলি শোভিত বাংলার প্রাণের প্রতীক!

মানবিকতার পতাকা তোমার হাতে–
দাঁড়িয়েছ বিশ্বসভায়– শান্তির দূত!
তোমার হৃদয়ে অপার বেদনা রেখা–
আজ সমগ্র পৃথিবীর আলোকরশ্মি!

বাঙালি জাতির উজ্জ্বল স্মারক তুমি;
মুক্তিকামী বিশ্বমানবের কণ্ঠস্বর...!
তোমার নির্ভীক মুখে চেতনার আলো;
এইতো আমাদের আস্থার বসবাস...!

হাজার সংকটে তোমার তেজস্বী হাত–
মানুষের কল্যাণে জাগ্রত অহোরাত...।

কবির অন্তর অধিবাসী

বদরুল হায়দার

হৃদয়ের দিঘিজল খুঁজে তুলে এনেছি তোমার মন।
আমি নদীমাতৃকতার ভূগোলে একলা থাকার
উপকূলে খুঁজি নিজস্ব ভুবন।

স্বপ্নজাল বুনে অগণনে আমি বিশ্বায়নে
ডুব দিই প্রাণে। ভাদ্র ও অগ্রহায়ণে তুমি মানবায়নে
শরতের কাঁশফুলে মেলে ধরো প্রশান্তির ডানা।

ভাব তরঙ্গের অজানারা হৃদয়সাগরে করে আনাগোনা
বঙ্গীয় আবেগে আমি দোটানায় বশীভূত হয়ে
ভুল করি চিরচেনা।

প্রতিদিন স্মরণ মরণ সংঘাতে হৃদয় আঘাত চলে।
তুমি বাঁধাধরা মিথ অতীতের বিপরীতে ডিজিটাল স্রোতে
রক্ষিত হৃদয় বাক্স খুলে ধরো মনের জানালা।

ভুলি অন্ধত্ব অপ্রেম বিরুদ্ধ সুনাম খ্যাতি।
আমি জাতি থেকে আত্মঘাতী অভিঘাতে নিজের অবাধ্যে করি
শত নানকার পালা। গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা
তুমি হয়ে ওঠো বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

বেদনার আসমুদ্রে চলে আমরণ গোপন উতলা।
তুমি উচ্ছলতার স্বদেশপ্রেমে রাখো শান্তি মানবতা।

পাষাণের ছলাকলায় আমি হয়ে উঠি চির ছদ্মবেশী।
তুমি নেতা জাতির পিতার উত্তরসূরি বাঙালি নারীর অবয়বে
সত্য সুন্দর মঙ্গলে চিরজীবী কবির অন্তর অধিবাসী।

শিয়রে দাঁড়িয়ে

সাইদ তপু

অনুপম চোখের চাহনি
সুগভীর দৃষ্টি বাংলার দিকে
এ মাটির সুধাঝরা
মমতার আবির ঝরে মুহুর্মুহু
সবুজের পথে-প্রান্তরে
ক্ষমতার উড্ডীনে আসীন
তবু নির্মোহ জীবন
চাওয়া নেই, পাওয়া নেই
শুধু আছে ভালোবাসা
অকুণ্ঠ প্রেম হৃদয়ঠাসা
অবিকল তোমার মতন
মায়াময়ী বাংলার রূপ
যেন করেছে ধারণ
ঘুমোও তুমি, ভেবো না অকারণ
শিয়রে দাঁড়িয়ে অনিমেষ
শোনো হে পিতা
তোমার দুচোখ দিয়ে দেখছে স্বদেশ
তোমারই দুহিতা
সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, উদারতা
মানবিক উষ্ণতায় গড়া এক
বসন্ত দিবাকর
ঝরে পড়ে আলো
যে আলোয় আজ আলোকিত বেশ
তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

শেখ হাসিনার মমতার হাত

মোহাম্মদ ইলইয়াছ

তোমার রুদ্ধ দুয়ার খুলে গ্যাছে আজ
পুবালি মুক্ত হাওয়ায়। আমরা কজন দীপ্ত
তরুণ যুবা, একমুঠো পলল মাটি নিয়ে–
দাঁড়িয়েছি মালঞ্চঘেরা সবুজ উঠোনে।

তোমার জলজ পুকুরে চেলা-পুঁটির সে কী
খলবলানি। পুকুরে মাছরাঙা পাখির ছোঁ
গাছের ছায়ায় আমরা কজন তরুণ যুবক
একগুচ্ছ লাল শাপলার ডাটা হাতে প্রদীপ্ত।

তোমার শাড়ির আঁচল উড়ছে দখিন বায়ে
তপ্ত ছায়ায় সেই আঁচল মানচিত্রজুড়ে
মমতার হাত আমাদের মাথায় স্নেহ ঝরায়
আমরা সব বাঙালি তোমার স্পর্শে দেখি।

কী মাল্য দেবো এই সংকটে, তার চেয়ে
দিলাম তোমার পাশে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা।

জয়তু মমতাময়ী

গোবিন্দলাল সরকার

জন্মের সুকৃতি ঘিরে পৃথিবীর পরে
ওই এল ওই এল জনক দুহিতা
অনক দুন্দুভি বাজে সুমন্দ্রিত স্বরে
আঁধারের বুকে হাসে সত্যের সবিতা
পাহাড়ের শিখাসম সে প্রাণ যে ধ'রে
সেই বুঝি এ মায়ের প্রজ্ঞা-পারমিতা
রাজর্ষি সে জনকের আশীষ অন্তরে
এ মাটির মায়া মেখে সেই জ্বালে চিতা;

প্রমত্তা পদ্মার বুক সেতু মণিহার
সমুদ্র বিজয়গাথা, মহাকাশ জয়
তিন বিঘা করিডোরে আনন্দ অপার
মানবতার জননী বিশ্বের বিস্ময়!
অযুত শারদপ্রভা তাই জন্মদিনে
জয়তু মমতাময়ী সত্যের বিপিনে।

স্বপ্নের মতো সুন্দর তুমি

ইজামুল হক

জনকের রক্তে ভেজা বাংলার এ মাটি
তোমাকেই চায়।
মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাই
বার বার ফিরে আসো তুমি।

বাঙালির হারানো গৌরব আর
কলঙ্ক মোচনের দায়
জীবনের চেয়ে কী গভীর মমতায়
বেছে নিলে তুমি।

তুমি আছো বলে
দ্রোহের আগুনে জ্বলে ওঠে যৌবন
রাজপথে নামে সাহসী মিছিল।

শহিদের স্বপ্ন আর
দুখি মানুষের ভালোবাসা
কী সহজে মুছে দিলো তোমার
ব্যক্তিগত সুখ।

তুমি বাঁচলে বাঁচবে বাংলাদেশ
তুমি বাঁচলে–
বেঁচে থাকবে দুখি মানুষের হাসি।
তুমি বাঁচলে–
বেঁচে থাকবে স্বপ্ন দেখার সাহস।
মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাই
বার বার ফিরে আসো তুমি।

কীর্তিময়ী শেখ হাসিনা

বেগম শামসুন নাহার

ব্যথাতুর তুমি চেপেছ বুকে পাষাণ,
দু'চোখের অশ্রু মুছে ফেলে–
কৌতূহলী স্বপ্নরাজের স্বপ্ন পূরণে
প্রথিতযশাদের কল্যাণে।
বীরের দেশে কুলু কুলু রবে
বহিছে পদ্মা-মেঘনার খরস্রোতার জল,
স্বপ্নের পদ্মা সেতু, ঢাকার বুকে মেট্রোরেল
অতল সাগরে গ্যাস অন্বেষণ,
পাতাল রেল, বাংলার সীমানা নির্ধারণ
স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ
কোভিড-১৯ টিকা
তিলোত্তমা ঢাকা।
গৃহহীনে গৃহদান, ভূমিহীনে ভূমি,
কামার-কুমার-জেলে-তাঁতি কৃষকের উপহার।
শিক্ষার্থীর শিক্ষা বিলাস, নারীর অধিকার,
বিশ্ব নেতৃত্বের–পুলকিত জয়গান।
লোকে বলে– মানবতার জননী তুমি–
আমরা বলি, তুমি বাংলার অহংকার,
স্বপ্ন পূরণে সাধ ছিল যত 'পিতার'
উত্তপ্ত সেই লাল সূর্যটার রক্তচ্ছটা,
বঙ্গমাতা-বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।
অবিরাম বয়ে চলা কীর্তিময়ীর কীর্তিগাথা
অসামান্য তুমি– যেন বাংলার ইতিহাস,
আর এক অধ্যায়–বাঙালি জাতির উচ্ছ্বাস।

সেতুবন্ধন পদ্মা

নিরু আক্তার অনু

হাজার নদীর স্বর্ণ খেয়া
সোনার বাংলাদেশ।
পদ্মা তাঁর স্বপ্নঘেরা অন্যতম রেশ।
তোমার কথাকলি এপার-ওপার
অচেনা সুদূর রয়ে যায়–
পাড়ি দিতে পথে দেরি খেয়া পারাপার।
খেসারত দিতে হয়–
কৃষক-শিল্পী-তাঁতি-জেলে-কামার-কুমার।
জনপদ থেকে জনপদ
বাঁক পথে পরিখা–
এই বাংলার অর্থনীতি
পরিচয় আধা আধা।
শুধু দরকার–
দুইপাড় মেলবন্ধনে বাঁধা।
তোমার বুকে সেতুবন্ধন!
খুলবে দুয়ার লক্ষ হাজার
স্বপ্ন আঁকে সম্ভাবনার।
বহুরূপী পদ্মা ভাঙনের ঢেউ
বুকে তার খরস্রোতা
জানে না তো কেউ।
মহুয়ার জনপদ মাওয়া থেকে জাজিরা–
সোয়া ছয় কিলোমিটার
এক নিমিষেই পাড়।
খুলে যাবে উন্নয়নের হাজার দুয়ার।
স্বপ্ন বুনে দিন চলে
আছি পাশে– পশ্চিমা দেয় আশ্বাস!
কূটচালের কূটাভাসে
গুটিয়ে লেজ পালায় অবশেষে।
সেই বীজমন্ত্র– বাঙালি জাতি হারতে জানে না।
ইতিহাসের পথ রক্তলেখা জয়তী
আরও একবার উদ্যোগ মহতী।
আঠারো কোটি বুকের মশাল
ছত্রিশ কোটি হাত।
একই বৃন্তে পাপড়ি মেলে–
আমরা তিতুমীর আর সূর্যসেনের জাত।
বিশ্বসেরা নিপুণ শিল্পীর শিল্পিত প্রয়াস
পদ্মার বুকে পদ্মা সেতু নতুন ইতিহাস।

শুভ জন্মদিন

মো. কামাল শেখ

মুকুটমণি আজকে তোমার জন্মদিন
উদ্বেলিত জাতির হৃদয় ক্লান্তিহীন।
উদ্ভাসিত স্বপ্নেরা সব সমুজ্জ্বল,
মহান তুমি বঙ্গ শোভা নীলোৎপল।
মুকুটমণি আজকে তোমার জন্মক্ষণ
ছন্দ ছড়া গান কবিতার বিচ্ছুরণ।
নতুন আলোয় রঙিন প্রভাত কল্পলোক,
সব নদী আর ফুল পাখিরা তোমার হোক।
মুকুটমণি তোমায় শুভ জন্মদিন
ভক্তি ভালোবাসার ডালা অন্তহীন।
তোমার পাশে বীর বাঙালি নিরন্তর
বাংলাদেশের হৃদয় তুমি রত্নাকর।

উন্নয়নের সোপান তিনি

আতিক রহমান

জাতির পিতার কন্যা তিনি
শেখ হাসিনা নামটি তাঁর
অসমাপ্ত পিতারই কাজ
নিলেন ভেবে আপনার।
উন্নয়নের সোপান তিনি
বিশ্বে তিনি উদাহরণ
গরিব-দুখির দুখে তিনি
তাদের জন্য কাঁদে মন।
দেশকে তিনি এগিয়ে নিলেন
উন্নয়নে বহুদূর,
তাঁকে আজি শ্রদ্ধা জানাই
তাঁর জন্য এ গান-সুর।

তোমার জন্মে ধন্য এ মাটি

মিজানুর রহমান মিথুন

অন্ধকার দুপায়ে অবলীলায় মাড়িয়ে চলা
তোমার আজন্ম স্বভাব।
তোমার মহান পিতার মতো দেশ, মাটি ও মানুষকে
অকৃপণ ভালোবাসাই তোমার মহান ব্রত।
বঙ্গমাতার পবিত্র উদরে জন্ম তোমার।
ঠিক তাঁর মতোই স্বপ্নে কিংবা জাগরণে
এ বাংলাকে ভাবছো আপন সংসার।
তুমি তোমার মায়ের মতো দুখিনি বাংলাকে
ভালোবেসে মায়ার সংসার পেতেছো।
তাইতো কোনো কিছু পরোয়া করো না তুমি।
তুমি কেবল ভালোবাসার কাছেই মাথা অবনত করো।
স্বজন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে শোককে করেছো শক্তি।
সেই শক্তিতে তুমি পথ চলো অবিচল।
দেশের সংকট কিংবা দুর্বিপাকে বুক পেতে দাও।
নির্ভীক নাবিকের মতো তুমি ধরেছো দেশের হাল।
সংকটে তুমি সম্ভাবনা খুঁজো।
দেশের দুর্দিন এলে তুমি তাকে
সুদিন বানানোর সুযোগ হিসেবে লুফে নাও।
তোমার হাতেই বাংলা খুঁজে পেয়েছে আসল ঠিকানা।
দেশের সীমানা ছাড়িয়ে তুমি বিশ্বের বিস্ময়।
তুমি পিতার উদার চিত্ত ধারণ করেছো।
তুমি এ মাটির সুবাস মেখে হয়েছো বিশ্বনেতা।
তোমার জন্মে এ মাটি ধন্য হয়েছে।

ইতিহাসের বাঁকে

আহসানুল হক

বইছে হাওয়া ঝিরিঝিরি
গাইছে পাখি গান
ভোরের আলো অন্যরকম
নদীর কলতান!

তারার আকাশ ঝলমলে খুব
বাজছে খুশির বীণ
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
আজকে জন্মদিন!

জাতির পিতা নেই বেঁচে নেই
এই আমাদের মাঝ
স্বপ্ন যে তাঁর করছে পূরণ
শেখ হাসিনা আজ!

পিতার মতন চিত্ত উদার
'মানবতার মা'
নীতির প্রশ্নে খুব অবিচল
হন না তো পিছপা!

তাঁর নেতৃত্বে আমরা এখন
'মধ্যম আয়ের' দেশে
সমৃদ্ধ দেশ হব ঠিকই
একচল্লিশের শেষে!

জন্মদিনে ছন্দ ছড়ায়
শ্রদ্ধা জানাই তাঁকে
পিতার মতো অমর হবেন
ইতিহাসের বাঁকে!

কেবল স্বপ্ন দেখি

রবিউল ইসলাম

কেবল স্বপ্ন দেখি
সব ত্যাগ তিতিক্ষার ফসল
বাড়ির উঠোন ভরে যাবে,

প্রাণ খুলে কবিতা লিখবো
সোনালি অতীত আর
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য।

কেবল স্বপ্ন দেখি
স্বশিক্ষিত হবে সব মানুষ
আত্মঘাতী দুর্নীতিবাজ বিলীন হবে,

মন খুলে খেলবো হাসবো
মুক্ত স্বদেশ আর
সুন্দর বাঙালির জন্য।

কেবল স্বপ্ন দেখি
পিতার যত ছিল স্বপ্ন
পূর্ণতায় উন্নত সবাই হবে,

অভাব দুর্দশা মুক্ত থাকবো
একই পরিচয় আর
সকলের ভালোর জন্যে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৩১শে আগস্ট ২০২১ বঙ্গভবনে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২১' উপলক্ষে বঙ্গভবন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

মৎস্য খাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সম্ভাবনাময় একটি খাত

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মৎস্য খাত দেশের আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একটি খাত। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এ খাতের সম্প্রসারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের অংশ হিসেবে ৩১শে আগস্ট বঙ্গভবন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, পাবদা, গুলশা, সুবর্ণ রুই, গলদা চিংড়ি, মহাশোলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে বিদ্যমান সম্প্রীতি অটুট রাখতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের মহান ঐতিহ্য। জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সকলকে সম্মিলিতভাবে সমাজে বিদ্যমান সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য অটুট রাখতে হবে। ৩০শে আগস্ট ২০২১ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। বাণীতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, জন্মাষ্টমী হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পরোপকারী, প্রেমিক, রাজনীতিক ও সমাজ সংস্কারক। সমাজ থেকে অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন ও হানাহানি দূর করে মানুষে মানুষে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মূল দর্শন। যেখানেই অন্যায়-অবিচার এ ধরাধামকে গ্রাস করেছে সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন আপন মহিমায়।

বর্তমানে বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্ব করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে চরমভাবে বিপর্যস্ত উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, করোনার কারণে দেশের জনগণের জীবন ও জীবিকা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকে ধারণ করে পরোপকারের মহান ব্রত নিয়ে মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ কাজের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ কাজের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধ হিসেবে গড়ে তুলতে এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠা করা তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কক্সবাজার হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমুদ্রসৈকত এবং পর্যটন কেন্দ্র। তাই কক্সবাজারকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিমানবন্দর সম্প্রসারণ হলে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে বা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে যত প্লেন যাবে তাদের রিফুয়েলিংয়ের জন্য সব থেকে সুবিধাজনক জায়গা হবে এই কক্সবাজার। বিমানের কর্মকর্তাদের দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের এবং সততা ও দক্ষতার সঙ্গে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস

পরিচালনার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি সিভিল এভিয়েশন নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সবকিছু যাতে আন্তর্জাতিক মানের হয় তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দেখার নির্দেশ দেন।

নৌ ও বিমানবাহিনীর নির্বাচনি পর্ষদ ২০২১-এর সভায় অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর 'নির্বাচনি পর্ষদ (প্রথম পর্ব) ২০২১'-এর সভায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কাজের প্রশংসা করেন এবং তিনি বলেন, তারা শুধু দেশেরই নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, দক্ষ এবং পেশাদার বাহিনী হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। তাদের আত্মত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে বিরল সম্মান ও মর্যাদা– যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও অত্যন্ত উজ্জ্বল করেছে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনি পর্ষদ সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের পদোন্নতির জন্য যে টিআরএসিই-ট্রেস পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তা একটি আধুনিক পদ্ধতি এবং এ পদ্ধতির ভিত্তিতে আপনাদের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা দিয়ে নির্বাচনি পর্ষদ আগামী দিনে যারা দক্ষতার সঙ্গে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী পরিচালনা করবেন, তাদের নির্বাচিত করবেন বলে উল্লেখ করেন।

তিন বিমানবন্দরে করোনার পিসিআর টেস্ট চালুর নির্দেশ

৬ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার ভার্চুয়াল বৈঠকে দেশের তিন বিমানবন্দরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট) জরুরি ভিত্তিতে করোনা সংক্রমণ শনাক্তকরণের পিসিআর টেস্ট চালুর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে সরকারি ঋণ আইন ২০২১, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন ২০২১ এবং বাংলাদেশ পুলিশ (অধস্তন কর্মচারী) কল্যাণ তহবিল আইন ২০২১-এর খসড়ারও অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী।

ভূমি ভবন উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ভূমি ভবন, ১২৯টি উপজেলা ও ৯৯৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম এবং ভূমি তথ্য ব্যাংক উদ্‌বোধন করেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এ উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে শতভাগ মিউটেশন সম্পন্ন করার মাধ্যমে ভূমিব্যবস্থা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হন, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে না হয় এবং ভূমি সেবা যেন হাতের মুঠোয় পায় সে ব্যবস্থাই সরকার করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে আগস্ট ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ের সমুদ্রে সম্প্রসারণ কাজের উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাত করেন– পিআইডি

পাঁচ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ভবনে বিদ্যুৎ বিভাগ আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে পাঁচ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেব এবং আলো জ্বালাবো। প্রধানমন্ত্রী জনগণকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার পরামর্শ দেন। কারণ বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় আনা সম্ভব হবে। পরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রকাশনা 'হান্ড্রেড'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

গণমাধ্যমের নৈতিকতা চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক বিকাশে গণমাধ্যমের প্রসারের পাশাপাশি এক্ষেত্রে নৈতিকতার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২৪শে আগস্ট রাজধানীর সেগুনবাগিচায় জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) আয়োজিত 'সাংবাদিকতায় বঙ্গবন্ধু' আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২১ তথ্য ভবনে বাংলাদেশের প্রেস কাউন্সিল আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী' শীর্ষক সেমিনার ও 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক-২০২১' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও সমাজের বহুমাত্রিক বিকাশের স্বার্থে গণমাধ্যমের প্রসার ও স্বাধীনতা যেমন প্রয়োজন, একইসঙ্গে সাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যমের নীতি-নৈতিকতাও আবশ্যক। তা না হলে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রাষ্ট্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রসারের সাথে নীতি-নৈতিকতা থাকলেই কেবল গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য সফল হবে।

'সাংবাদিকতায় বঙ্গবন্ধু' প্রসঙ্গে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন সাংবাদিকবান্ধব নেতা ছিলেন। তখন যারা সাংবাদিক ছিলেন তারা বঙ্গবন্ধুকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। সেই কারণে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বাঙালির জন্য তাঁর চিন্তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সাংবাদিক সমাজের জন্য যা করেছেন তা অতীতে কেউ করেনি। করোনার মধ্যে এদেশে তিনি সাংবাদিকদের সহায়তায় যে উদ্যোগ নিয়েছেন, আশপাশের দেশে তা করা হয়নি। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিকদের তেমন কোনো জোরালো দাবি ছিল না, প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন। আজ কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে হাজার হাজার সাংবাদিক উপকৃত হচ্ছেন এবং এটি সাংবাদিকদের একটি ভরসাস্থল। কেউ মৃত্যুবরণ করলে পরিবার তিন লাখ টাকা পায়। সাংবাদিকদের পরিবারকে সহায়তার জন্যও নীতিমালার খসড়া হয়েছে। ডিআরইউ'র এই জায়গাটাও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন। আর জাতীয় প্রেসক্লাবের জায়গা বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের যাত্রাও বঙ্গবন্ধু কন্যার হাত ধরে। সেখানে অনেক কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একনিষ্ঠ কাজ দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ একনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন বলেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২৫শে আগস্ট সচিবালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। কোনো একটা ভুল বিবৃতির জন্য সরকারের রাজনৈতিক অংশের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যে ঘনিষ্ঠভাবে কাজের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তা বিনষ্ট হতে পারে না, হয়নি এবং হবেও না। তাই আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো যে, আজকে যেভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তাঁকে ইতিহাসের পাতা থেকে নির্বাসিত করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু সেই অপচেষ্টাকারীরাই ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাচ্ছে। এটা ইতিহাসের বিচার। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ রচনার সার্থকতা সেখানেই যে, আজ পাকিস্তান আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমাদের মতো উন্নতি অর্জন করতে চায়। আর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সার্থকতা সেখানেই যে, আজকে সমগ্র পৃথিবী বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রশংসা করে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ইউএনডব্লিউটিও- এর দক্ষিণ এশিয়ার ভাইস চেয়ার নির্বাচিত

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO)-এর কমিশন ফর সাউথ এশিয়ার (CSA) ২০২১-২০২৩ মেয়াদে দুই বছরের জন্য ভাইস চেয়ার নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাথে ইরানও (CSA)-এর ভাইস চেয়ার নির্বাচিত হয়।

কমিশন ফর এশিয়া প্যাসিফিক ও কমিশন ফর সাউথ এশিয়ার (CSA) যৌথভাবে আয়োজিত ভার্চুয়াল সম্মেলনে বাংলাদেশ ভাইস চেয়ার হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মহাসচিব জুরাব পোলোলিকাশ ভিলি। এর আগের ২০১৯-২০২১ মেয়াদে (CSA)-এর ভাইস চেয়ার ছিল ভারত ও শ্রীলংকা। ৬টি আঞ্চলিক সংগঠনের সমন্বয়ে জাতিসংঘের এই পর্যটন বিষয়ক বিশ্ব সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সাইবার নিরাপত্তায় সার্কে শীর্ষে বাংলাদেশ

এস্তোনিয়া ভিত্তিক ই-গভর্ন্যান্স অ্যাকাডেমি ফাউন্ডেশনের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ২৭ ধাপ অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশের। ৫৯.৭৪ নম্বর পেয়ে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে প্রথম বাংলাদেশ। বিশ্বের ১৬০টি দেশের সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল উন্নয়ন পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা এ- সূচকে বাংলাদেশ ৩৮তম স্থানে উঠে এসেছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬৫তম। এনসিএসআই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সর্বশেষ সূচকে ৯৬.১০ স্কোর নিয়ে প্রথম স্থানে আছে গ্রিস। এরপর ৯২.২১ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় চেক রিপাবলিকান এবং ৯০.৯১ স্কোর নিয়ে এস্তোনিয়া তৃতীয় অবস্থানে আছে।

প্রতিবেদনঃ সাবিনা ইয়াসমিন

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ২৪শে আগস্ট ২০২১ ভার্চুয়ালি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রবাসীদের রেমিটেন্স পাঠানোর মাধ্যম 'ব্লেজ' সার্ভিসের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

পায়রা বন্দর থেকে সরকারের রাজস্ব আয় ৩০৪ কোটি টাকা

দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রা থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ৩০৪ কোটি টাকা। বন্দরটি চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত গত পাঁচ বছরে পাকাপোক্তভাবে দেশীয় অর্থনীতিতে অংশীদারিত্ব করছে এ বন্দর।

'বন্দর থেকে এগিয়ে চলার বাংলাদেশ'-এ স্লোগান নিয়ে পায়রা বন্দর অর্থনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিল ২০১৬ সালের ১লা আগস্ট। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্‌বোধন করেন। প্রথমদিনে প্রথম পণ্যবাহী জাহাজ ছিল ফরচুন বার্ড। এ পর্যন্ত এ বন্দরে মোট ১৫০টি পণ্যবাহী জাহাজ পণ্য খালাস করেছে। সেই থেকে ২০২১ সালের ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত এ বন্দর থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ৩০৪ কোটি টাকা। বন্দর কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।

ব্যাংক চালু হয়েছে পায়রা বন্দরে। ইতোমধ্যে পায়রা বন্দর প্রকল্প এলাকায় প্রশাসনিক ভবন, সার্ভিস জেটি, পন্টুন, সিকিউরিটি ভবন, ওয়্যার হাউস, পানি শোধনাগার চালু হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীর আবাসিক ভবন নির্মাণকাজ শেষের পথে।

রেমিটেন্সের ৫৬ শতাংশ এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে

করোনা মহামারির মধ্যেও প্রবাসী বাংলাদেশির রেমিটেন্স পাঠানো অব্যাহত রেখেছেন। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) প্রবাসীরা ৩৮০ কোটি ১৫ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ রেমিটেন্স দেশে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের আট দেশ থেকে এসেছে মোট রেমিটেন্সের ৫৬ শতাংশ বা ২০৫ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা প্রতি ডলার ৮৫ টাকা ধরে)। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, প্রবাসী আয় পাঠানোর শীর্ষে থাকা ১০টি দেশের মধ্যে ৫টি হলো মধ্যপ্রাচ্যের।

প্রতিবেদনঃ শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাইজড সেবা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কারিগরি সহায়তায় 'মাইগভ র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন' পদ্ধতির আওতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩০৩টি ডিজিটাইজেশন সেবার উদ্‌বোধন করা হয় ১৫ই সেপ্টেম্বর। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সেবাসমূহের উদ্‌বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির

মধ্যে অন্যতম একটি উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে বিগত ১২ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার কারণে করোনা মহামারির সময়ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও করোনাকালীন ১৯ মাসে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনিক কার্যক্রম, বিচার ব্যবস্থাসহ সবকিছু সচল ছিল। তিনি বলেন, ২০১৬ সালে সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশনায় ই-নথি ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় দুই কোটির অধিক ফাইল ই-নথি সিস্টেম ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়েছে। করোনাকালীন বিভিন্ন অফিসসমূহের লক্ষাধিক কর্মকর্তা ইলেকট্রনিক ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করেছে। এর মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা সাশ্রয়ের পাশাপাশি সময় ও যাতায়াতের হয়রানি থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং লকডাউনে কোনো প্রশাসনিক কাজ বন্ধ ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের ৭৩টি লাইব্রেরি, ৩০০ কোটির অধিক টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় আর্কাইভ ডিজিটাইজ এবং আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাতিঘর বাংলা একাডেমিকে ডিজিটাইজ করার বিষয়ে আইসিটি বিভাগ প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'মাইগভ র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন' পদ্ধতিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাইজড সেবাসমূহের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন – পিআইডি

সভাপতির বক্তব্যে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, মাইগভ র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন প্ল্যাটফর্মের আওতায় ইতোমধ্যে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে, তার মধ্যে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ সংখ্যক সেবার (৩০৩টি) ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্র ও কর্মপরিধি কত ব্যাপক। মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ১৭টি দফতর-সংস্থার মধ্যে ১০টি দফতর-সংস্থার ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে। বাকি সাতটি সংস্থার র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাইজেশনকৃত সেবার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে তৈরি হবে হুন্দাইয়ের গাড়ি

আগামী বছরের মধ্যে বাংলাদেশে হুন্দাইয়ের যাত্রীবাহী গাড়ি তৈরি হবে। ফলে দেশে তুলনামূলক কম দামে বিদেশি ব্র্যান্ডের গাড়ি পাওয়া যাবে। হুন্দাই ও ফেয়ার টেকনোলজি যৌথভাবে যাত্রীবাহী গাড়ি উৎপাদনের কারখানা গড়ে তুলছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে এ কারখানাটি হবে।

৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ফেয়ার টেকনোলজিস-হুন্দাই থ্রি এস সেন্টারের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এ সেন্টারের উদ্‌বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশীয় শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছে সরকার। ফলে এখন থেকে দেশেই বিক্রি, বিক্রি-পরবর্তী সেবা ও খুচরা যন্ত্রাংশ কেনার সুবিধা পাবেন বিদেশি গাড়ি কোম্পানির গ্রাহকরা।

পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ

বিশ্ব বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামকে আবার ছাড়িয়ে গেল বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথমে রপ্তানি পরিসংখ্যানে ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ২০০ কোটি ডলার বেশি। চলতি বছর শেষে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ভিয়েতনামের চেয়ে এগিয়ে থাকবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের রপ্তানি উন্নয়ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, বছরের শুরুতেই এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। জানুয়ারিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৮৬ কোটি ডলার। ভিয়েতনামের পরিমাণ ছিল ২৬৬ কোটি ডলার। পরের মাসে ব্যবধান আরো বাড়ে। ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের ২৬৩ কোটি ডলারের বিপরীতে ভিয়েতনামের এ পরিমাণ ছিল ১১৪ কোটি ডলার। অর্থাৎ মাসটিতে ভিয়েতনামের রপ্তানি বাংলাদেশের অর্ধেক। মার্চে অবশ্য ভিয়েতনাম এগিয়ে যায় সামান্য ব্যবধানে। এপ্রিলে আবারও ভিয়েতনামের দ্বিগুণ দাঁড়ায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি। সর্বশেষ জুলাই পর্যন্ত সাত মাসের পরিসংখ্যানে মোট রপ্তানিতে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে

সরকার নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরিতে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার ২০৪১ সালে কর্মস্থলে নারীর অংশগ্রহণ ৫০:৫০ উন্নীত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও পণ্য বিপণন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করছে। সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বহুমুখী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। আমি ২০১৯ সালে এখানে এসে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণের ঘোষণা করেছিলাম। প্রথম ফেজেই চট্টগ্রামে দশতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এই ভবনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ডে-কেয়ার সেন্টার ও নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে। যার মাধ্যমে চট্টগ্রামের নারীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। প্রতিমন্ত্রী ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২১ চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয় ও প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণ স্থান পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন। এসময় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম বলেন, চট্টগ্রাম মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের দশতলা ভবন নির্মিত হলে একই স্থান থেকে নারী ও শিশু উন্নয়নে সরকারের সকল সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে যুব সমাজকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। ৩০শে আগস্ট ২০২১ মেহেরপুরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স ও যুব ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। তারা যদি সুস্থভাবে জীবনযাপন না করে তবে, তাদের কর্মক্ষমতা সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তাই, এদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে, যুব সমাজকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিদেশে কর্মরত এদেশের শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু সেই তুলনায় তাদের আয় অনেক কম। কারণ, এদেশ থেকে অনেক সময় অদক্ষ শ্রমিক প্রেরণ করা হয়। তাই বিদেশে যেতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের উপার্জন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মো. মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার মো. রাফিউল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ম্যাগসাইসাই পেলেন বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরী

'এশিয়ার নোবেল' হিসেবে পরিচিত ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরী। ৩১শে আগস্ট ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ফেরদৌসী কাদরী আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) ইমেরিটাস বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরী

ফেরদৌসী কাদরীর ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিভাগ থেকে স্নাতক ও ১৯৭৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮০ সালে যুক্তরাজ্যের লিভারপুল ইউনিভার্সিটি থেকে প্রাণ রসায়নে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে আইসিডিডিআরবিতে যোগ দেন।

ফেরদৌসী কাদরীকে এই পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে র‍্যামন ম্যাগসাইসাই কমিটি অভিজ্ঞানপত্রে বলেছে, বিজ্ঞান পেশায় তার জীবনভর আত্মনিয়োগ ও আন্তরিক আগ্রহকে স্বীকার করছে বোর্ড অব ট্রাস্টি। মানব ও ভৌত অবকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর অবিচল লক্ষ্য বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে, সুনির্দিষ্টভাবে নারী বিজ্ঞানীদের। টিকার উদ্ভাবন, উন্নততর জৈবপ্রযুক্তিক প্রতিষেধক এবং জটিল গবেষণায় তাঁর আন্তরিক অবদান লাখ লাখ প্রাণ রক্ষায় সহায়ক হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি কর্মজীবী নারী রংপুরে

দেশে এলাকাভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি কর্মজীবী নারী রয়েছে রংপুর বিভাগে। সেখানকার ৩৬ শতাংশ নারী কাজ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে ২২.৯৫ শতাংশ কর্মজীবী নারী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তবে ২০ শতাংশের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। পেশাগতভাবে সবচেয়ে বেশি ৫৩.৮ শতাংশ রয়েছেন কৃষি, মৎস্য ও বনজ খাতে আর ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগে সর্বনিম্ন ৮ শতাংশ নারী কাজ করেন। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক-অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। ২৯শে

আগস্ট 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ভূমিকা' শীর্ষক অনলাইন আলোচনায় গবেষণার এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মূল্যায়ন, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং জিডিপির মধ্যে সম্পর্কের পরিমাণ নির্ধারণ করাই ছিল গবেষণার উদ্দেশ্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮৫০টি থানায় ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সি নারীদের ওপর জরিপটি পরিচালিত হয়। নারীর কর্মসংস্থান হলে জিডিপিতে এর প্রভাব সম্পর্কে সানেম বলছে, নারীর কর্মসংস্থান ১ শতাংশ বাড়লে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায় ৩১ শতাংশ।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি

১০ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি হালনাগাদ করেছে সরকার। এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০ লাখ হওয়ার কথা থাকলেও এতে কম ছিল ৫০ হাজারের। এখন এদের যুক্ত করেছে সরকার। একইসঙ্গে মারা যাওয়া ও স্থানান্তর হওয়া উপকারভোগীদের বিবেচনায় নিয়ে তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে তিন মাসের জন্য শুরু হয়েছে এ 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি'।

'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি'র আওতায় দেশব্যাপী হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে প্রতি মাসে ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়া হয়। বছরে এ সহায়তা দেওয়া হয় পাঁচ মাস। নতুন করে অতিদরিদ্র উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করে সেপ্টেম্বর থেকেই চাল বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করে ১৯শে আগস্ট খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক চিঠি দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে।

খাদ্য অধিদপ্তরের পাঠানো উপকারভোগীর তালিকা অনুসারে সারা দেশে ৪৯২টি উপজেলার তথ্য যাচাই করে। এতে ৫০ লাখ উপকারভোগীর তালিকায় প্রায় ৪৬ হাজার ৫০০ জন অতিদরিদ্র ব্যক্তিকে তালিকাভুক্ত করা যায়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে দেশের দারিদ্র্য মানচিত্র ২০১৬ (গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল) প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের নভেম্বরে। ওই তথ্য অনুযায়ী ২২৪টি উপজেলায় যে পরিমাণ উপকারভোগী থাকার দরকার এর চেয়ে কম রয়েছে। উপজেলা অনুযায়ী খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন করে যে সংখ্যক উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা যাবে সে তালিকা করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে যথাযথভাবে নীতিমালা অনুসরণ করে সেপ্টেম্বরে চালু হয়ে যাওয়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ২২৪টি উপজেলায় ৪৬ হাজার ৬১৫ জন নতুন উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক অনুদান পেলেন ক্রীড়াঙ্গনের সাত ব্যক্তি

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রেসবক্সের সংস্কার কাজ চলছে। এর নাম হবে বাদল রায় প্রেসবক্স। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাবেক তারকা ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক প্রয়াত বাদল রায়সহ অসুস্থ কয়েকজন ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়া সংশ্লিষ্টদের আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে সাতজনের হাতে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তার এক কোটি ১০ লাখ টাকা চেক, সঞ্চয়পত্র ও একটি ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্র তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

শকুন সংরক্ষণকারী ব্যক্তি ও সংস্থাকে সরকারি স্বীকৃতি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতাকর্মী শকুনের বিকল্প নেই। শকুন সংরক্ষণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। কিন্তু শকুনসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সরকারের একার পক্ষে কষ্টসাধ্য। তাই প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তিবর্গ ও বিজ্ঞানীদের শকুন রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, সরকার শকুন সংরক্ষণকারী ব্যক্তি ও সংস্থাকে সরকারি স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মন্ত্রী ৪ঠা সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস' উপলক্ষে বন অধিদপ্তর আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শকুন সংরক্ষণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এবছর জানুয়ারি মাসে সরকার শকুনের জন্য ক্ষতিকর ঔষধ কিটোপ্রোফেন নিষিদ্ধ করেছে, যা শকুন রক্ষায় বিশ্বব্যাপী একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য ক্ষতিকর ঔষধ যেমন ফ্লুনিক্সিন, এসিক্লোফেনাক যেন আমাদের দেশের বাজারে না আসে সে ব্যাপারেও মন্ত্রিপরিষদ নির্দেশনা দিয়েছে। শকুনের জন্য নিরাপদ ঔষধ মেলোক্সিক্যাম রোগাক্রান্ত পশুদের জন্য ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালে দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ঔষধ ডাইক্লোফেনাক নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে আমরা যে মাইলফলক অর্জন করেছি তা বিশ্ব সংরক্ষণ সম্প্রদায়ের কাছেও একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তিনি বলেন, শকুন সংরক্ষণে 'বাংলাদেশ জাতীয় শকুন সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। ২০১৪ সালে দেশের দুটি অঞ্চলকে শকুনের জন্য নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৫ সালে শকুনের প্রজননকালীন সময়ে বাড়তি খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য হবিগঞ্জের রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে ও সুন্দরবনে দুটি ফিডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, ২০১৬ সালে প্রণীত ১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ শকুন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিয়েই শকুন সংরক্ষণে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৬ সালে অসুস্থ ও আহত শকুনকে উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিনাজপুরের সিংড়ায় একটি শকুন উদ্ধার ও পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ১১৫টি হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির শকুন উদ্ধার এবং পরিচর্যার পর প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে হবিগঞ্জের রেমা-কালেঙ্গায় শকুনের প্রজনন সফলতা ৪৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৫৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২০ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয় শকুন সংরক্ষণ কমিটি'-এর ১০ম সভায় শকুনের দুটি হটস্পট যথা– হবিগঞ্জের রেমা-কালেঙ্গা ও সুন্দরবনে

বিদ্যমান শকুনের নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় বাজেট বরাদ্দ এবং প্রতি দুই বছর অন্তর শকুনের অবস্থা মনিটরিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। টিকে থাকা শকুনগুলো রক্ষায় সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বিমানের আর্থিক সাশ্রয় ৬ লাখ মার্কিন ডলার

বিমানের দক্ষ প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানগণের মাধ্যমে এই প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজের সি-চেক মতো আধুনিক উড়োজাহাজ সি-চেক করার সক্ষমতা রয়েছে। এর আগে বিমানের যে-কোনো ধরনের নতুন উড়োজাহাজের সি-চেক জার্মানি, ইতালি অথবা সিঙ্গাপুরে বিদেশি এমআরও-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। নিজস্ব জনবল ও ব্যবস্থাপনায় ড্রিমলাইনারের সি-চেক সম্পন্ন করা বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী বিমানকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু করার ফলেই এই সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

করোনার কারণে চীনের উহানে অবরুদ্ধ বাংলাদেশিদের উদ্ধারে ফ্লাইট পরিচালনাকারী বিমানের কর্মীদের প্রশংসা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সবসময়ই দেশ ও দেশের মানুষের প্রয়োজনে নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে কাজ করে। এই কোভিড-১৯ মহামারির সময়েও তার ব্যত্যয় হয়নি। বিমানের পাইলটি এবং কেবিন ক্রুগণ দেশের ও জনগণের স্বার্থে জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং এয়ারলাইন্স

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ২৯শে আগস্ট ২০২১ ঢাকায় দিয়াবাড়িতে ভায়াডাক্টের উপর মেট্রোরেলের পারফরমেন্স টেস্টের সূচনা করেন– পিআইডি

দেশেই সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বিমানের আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে ছয় লাখ মার্কিন ডলার। এবছর আরও ১টি ও আগামী বছর আরও ৪টি ড্রিমলাইনারের সি-চেক দেশেই সম্পন্ন হবে ফলে আরও ৩ থেকে ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সাশ্রয় হবে বিমানের।

৫ই সেপ্টেম্বর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রধান কার্যালয় 'বলাকা'-তে ড্রিমলাইনারের সফল সি-চেক সমাপনী ও কোভিড-১৯ মহামারির শুরুর দিকে চীনের উহান শহরে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের উদ্ধারে ফ্লাইট পরিচালনাকারী বিমান ক্রুদের সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী এ তথ্য জানান।

সি-চেক একটি দীর্ঘমেয়াদি, জটিল এবং উচ্চ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন চেক যাতে উড়োজাহাজের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্মোচন করে বিশদভাবে পরীক্ষা শেষে উড়োজাহাজকে নভোযোগ্য করা হয়। বোয়িং-৭৮৭ মডেলের ড্রিমলাইনারের সি-চেক প্রতি তিন বছর পর পর সম্পন্ন করতে হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ই আগস্ট, থেকে বোয়িং ড্রিমলাইনার 'আকাশবীণা'-এর প্রথম সি-চেক কার্যক্রম শুরু করে ১০ কর্ম দিবসে এর সফল পরিসমাপ্তি করে বিমান।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের খুব কম এয়ারলাইন্সেরই ড্রিমলাইনারের ও বিমানবন্দর কর্মীদের আন্তরিকতা, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের কারণেই তখন সারা বিশ্ব থেকে আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাইনি।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস

শোষিত-নিপীড়িত মানুষের বঞ্চনার ক্ষোভ দীপ্ত শিখার মতো জ্বলে উঠেছিল যাঁর কণ্ঠে, সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িকতা তথা মানবতার বাণী শুনিয়েছিলেন যিনি– সেই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৫তম প্রয়াণ দিবস ছিল ২৭শে আগস্ট। এ দিন কবিকে ফুলেল শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে সর্বস্তরের জনসাধারণ ও সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষ। শ্রদ্ধার ফুলে সমাধিসৌধকে ঢেকে দিয়ে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অনন্য নজির স্থাপন করেছে শিল্পী, সাহিত্যিক, সুহৃদ, শিল্পানুরাগী, পরিবারের সদস্য, স্বজন ও

ভক্তরা। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা আয়োজনে স্মরণ করেছে কবিকে। সমাধিতে ফুলেল শ্রদ্ধা, কবির সৃষ্টি গানে ও কবিতায় সাজানো ছিল মৃত্যুবার্ষিকী পালনের এই আয়োজন। সকালে সমাধিতে ফুলেল শ্রদ্ধা আর বিকেলে কথা, গান ও নৃত্যে কবির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষ।

১৯৭২ সালের ২৪শে মে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে কবি নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। তাঁকে দেয় জাতীয় কবির মর্যাদা। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কবিকে নাগরিকত্ব দেয়। একই বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি একুশে পদকে ভূষিত করা হয় কবিকে।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ অবিভক্ত বাংলায় বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া যে কবির আবির্ভাব ঘটেছিল জ্যৈষ্ঠের ঝড় হয়ে সে ঝড় চিরতরে থেমে যায় ঢাকার পিজি হাসপাতালের কেবিনে ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্রে। অঙ্কের হিসাবে তাঁর জীবনকাল ৭৭ বছরের। তবে সৃষ্টিশীল ছিলেন মাত্র ২৩ বছর। নজরুলের এই ২৩ বছরের সাহিত্য জীবনের সৃষ্টিকর্ম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। জাতি তাই যথাযোগ্য মর্যাদায় গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণ করে এ কবিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত কবির সমাধি ছেয়ে যায় ফুলে ফুলে।

প্রতিবেদনঃ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

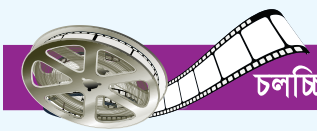

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০-এর জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০ সালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট প্রযোজকদের কাছ থেকে চলচ্চিত্র জমাদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেন্সর বোর্ড থেকে এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০-এর জন্য চলচ্চিত্রের আবেদনপত্র ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২১ রোববার বিকেল ৫টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।

অংশগ্রহণকারী প্রযোজকগণকে তাঁদের নিজ নিজ চলচ্চিত্রের একটি উন্নতমানের সিডি, ডিভিডি ও পেনড্রাইভ এবং নির্ধারিত ছকে প্রযোজক, পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ জীবনবৃত্তান্ত (বাংলায়), চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ, গানের কথা ইত্যাদি প্রতিটির ১৫ (পনেরো) সেট ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ও সদস্য-সচিব, জুরি বোর্ড, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০, তথ্য ভবন (লেভেল ১৩ ও ১৪), ১১২ সার্কিট হাউস রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০, এই ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।

পুরস্কারের ক্ষেত্রসমূহঃ আজীবন সম্মাননা, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী খল চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী, শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক, শ্রেষ্ঠ গায়ক, শ্রেষ্ঠ গায়িকা, শ্রেষ্ঠ গীতিকার, শ্রেষ্ঠ সুরকার, শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার, শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা, শ্রেষ্ঠ সম্পাদক, শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক, শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক, শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক, শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা এবং শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান।

আবেদনপত্রে অনুসরণীয় শর্তাবলি হলো: কেবল বাংলাদেশি নাগরিকগণ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন; আজীবন সম্মাননা পুরস্কারের জন্য জীবিত ব্যক্তিদেরকে বিবেচনা করা হবে; যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। তবে যৌথ প্রযোজনা চলচ্চিত্রের বিদেশি শিল্পী এবং কলাকুশলীগণ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিবেচনাযোগ্য চলচ্চিত্রকে অবশ্যই বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত এবং বিবেচ্য বছরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত হতে হবে। স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না, তবে তা ২০২০ সালে সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত হতে হবে; পুরস্কারযোগ্য প্রতিটি শাখায় গুণগত ও শৈল্পিক মানে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে; দেশীয় প্রেক্ষাপট, পরিচালকের মৌলিকত্ব ও সৃজনশীলতার সাক্ষর বহনকারী চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে; জুরি বোর্ডের বিবেচনার জন্য প্রতিটি নৃত্যের জন্য পৃথকভাবে নৃত্য পরিচালকের নাম উল্লেখ করতে হবে। একইভাবে প্রতিটি গানের (পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন) জন্য পৃথকভাবে গায়ক, গায়িকা, গীতিকার এবং সুরকারের নাম উল্লেখ করতে হবে; কাহিনির ক্ষেত্রে দেশি বা বিদেশি লেখক-প্রকাশকের অনুমতি (কপিরাইট) নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে; বিদেশি চলচ্চিত্রের কপিরাইট নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র এবং রিমেক (Remake) চলচ্চিত্রের কাহিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না; জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য অংশগ্রহণকারী কোনো চলচ্চিত্রে সেন্সরবিহীন কোনো দৃশ্য সংযোজন এবং সেন্সরকৃত কোনো অংশ বিয়োজন করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে চলচ্চিত্রটি পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না; সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রধান প্রধান দৃশ্য ও সংলাপ সংবলিত বিষয়বস্তুর ওপর পাঁচ মিনিটের (কম-বেশি) ১টি সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য জমাকৃত চলচ্চিত্রটির সাথে জমা দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক কর্তৃক যে সকল শিল্পী ও কলাকুশলীদের পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে তাদের নাম চলচ্চিত্রের টাইটেলে উল্লেখ থাকতে হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রযোজকদেরকে নির্ধারিত ছকে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ফরম ও ছক বিনামূল্যে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনের ফরম সেন্সর বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bfcb.gov.bd থেকে ডাউনলোড করেও ব্যবহার করা যাবে। প্রত্যেক আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের যথাযথ মানসম্পন্ন সিডি, ডিভিডি ও পেনড্রাইভ জমা দিতে হবে। কোনো সিডি, ডিভিডি ও পেনড্রাইভ মানসম্মত না হলে তা বিবেচনা না করার ক্ষমতা জুরি বোর্ড সংরক্ষণ করে। প্রতিটি চলচ্চিত্রের জন্য পৃথকভাবে আবেদনপত্র ও সিডি, ডিভিডি ও পেনড্রাইভ জমা দিতে হবে। পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত শিল্পী, কলাকুশলী, ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত (বাংলা), জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), শিশুদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন

সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনের সাথে অবশ্যই জমা দিতে হবে। যাদের অনুকূলে জীবনবৃত্তান্ত (বাংলা) ও জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, জন্মনিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দেওয়া হবে না তাদের আবেদন জুরি বোর্ড কর্তৃক বিবেচিত হবে না। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ সম্পর্কিত যে-কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

বান্দরবানে প্রধানমন্ত্রীর করোনা প্রণোদনা ঋণ বিতরণ

বান্দরবানের থানচিতে প্রধানমন্ত্রীর কোভিড-১৯ আর্থিক প্রণোদনা স্বল্প সুদে ঋণ প্যাকেজের আওতায় দুই লক্ষ টাকা করে ঋণ পেল দুই উদ্যোক্তা। ২৪শে আগস্ট থানচি উপজেলার উদ্যোক্তাদের মাঝে উপজেলা পরিষদ মিলানায়তনে এ আর্থিক প্রণোদনা ঋণ বিতরণ করা হয়।

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (বিআরডিবি) মো. আবু তৈয়ব বলেন, প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ আর্থিক প্রণোদনা ঋণ প্যাকেজের আওতায় পল্লি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির এবং মাঝারি শিল্প খাতকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে থানচি উপজেলা বরাদ্দ পরিমাণ মতো উদ্যোক্তাদের এ আর্থিক প্রণোদনা ঋণের আওতায় আনা হয়েছে। আপাতত দুজন উদ্যোক্তাকে দুই লক্ষ টাকা করে মোট চার লক্ষ টাকা স্বল্প সুদে প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। আগামীতে আরও ১০-১৫ জনকে দুই লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে।

রাঙামাটিতে পল্লি উদ্যোক্তার মাঝে প্রথম পর্যায়ে এক কোটি ৪৮ লাখ টাকার ঋণ বিতরণ

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলা বিআরডিবির উদ্যোগে ২৪ জন পল্লি উদ্যোক্তার মাঝে ৫১ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। ২৫শে আগস্ট কাপ্তাই উপজেলা বিআরডিবি অফিসে রাঙামাটি জেলার বিআরডিবির উপপরিচালক মো. এনামুল হক প্রধান অতিথি উপস্থিত থেকে উপকারভোগীদের মাঝে এই চেক বিতরণ করেন। কাপ্তাই উপজেলা বিআরডিবির কর্মকর্তা বলেন, কাপ্তাই উপজেলা সদর কার্যালয় থেকে প্রথম পর্যায়ে ৭১ জন উদ্যোক্তাকে এযাবৎ এক কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের সিরিজ জয়

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টিতে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ জাতীয় দল। ১লা সেপ্টেম্বর

শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া সিরিজের প্রথম ম্যাচে দাপুটের সাথে ৭ উইকেটে জয় পায় টাইগাররা। দ্বিতীয় ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৪ রানে জয় পেলেও সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৫২ রানে হারতে হয় বাংলাদেশকে। পরবর্তীতে ৮ই সেপ্টেম্বর সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। ৬ উইকেট হাতে রেখে ম্যাচ জয়ের মাধ্যমে সিরিজ নিশ্চিত করে টাইগাররা। এই সিরিজ জয়ের মাধ্যমে আইসিসি'র টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সপ্তম আসর শুরু হবে আগামী ১৭ই অক্টোবর থেকে। ওমানে প্রথম রাউন্ডের উদ্‌বোধনী ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে টাইগাররা। তার আগে ৩রা অক্টোবর ওমানের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। ১৯শে সেপ্টেম্বর বিসিবি ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান গণমাধ্যমকে জানান, বিশ্বকাপ খেলতে আগামী ৩রা অক্টোবর দেশ ছাড়বে বাংলাদেশ দল এবং ৪ তারিখ ওমানে গিয়ে পৌঁছাবে। সেখানে একদিন কোয়ারেন্টাইন করবে পুরো দল। এর পরই অনুশীলন শুরু করবে।

বাংলাদেশে প্রথম বিচ বক্সিং

এই প্রথম বক্সিং হবে কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতে। জানুয়ারিতে বসবে সিনিয়র বিচ বক্সিং প্রতিযোগিতার আসর। ১৪ই সেপ্টেম্বর বক্সিং ফেডারেশনের নতুন সভাপতি ও বাংলাদেশ আনসারের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীমকে বরণ করে নেওয়া হয় এক অনুষ্ঠানে। সেই অনুষ্ঠানে একথা বলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম তুহিন। নতুন সভাপতি বলেন, 'জানুয়ারিতে সমুদ্রসৈকতে প্রথমবারের মতো সিনিয়র বিচ বক্সিং প্রতিযোগিতা হবে। একই মাসে আরব আমিরাতের আবুধাবিতে বিশ্ব স্কুল বক্সিং প্রতিযোগিতায় আমরা অংশ নেব। আগামী বছর এসএ গেমসে স্বর্ণপদক জয়ের লক্ষ্যে কাজ করছি।'

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সততা আর নৈতিকতা শুদ্ধাচারের মূল কথা

না ফেরার দেশে লেখক-গবেষক বশীর আল হেলাল

আফরোজা রুমা

কথাসাহিত্যিক, গবেষক, বাংলা একাডেমির ফেলো ও সাবেক পরিচালক বশীর আল হেলাল চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৩১শে আগস্ট রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নিজ বাসায় বার্ধক্যজনিত জটিলতায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

বশীর আল হেলাল ১৯৩৬ সালের ৬ই জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামের মীরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তালিবপুর, জলপাইগুড়ি, রাজশাহী এবং কলকাতাতে শিক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাস করার পর কলকাতায় হজ কমিটিতে চাকরি নেন। তখন মাওলানা আযাদের ছেলে আকরাম খান কলকাতা থেকে একটি পত্রিকা বের করতেন। পত্রিকাটি সপ্তাহে তিন দিন বের হতো। হজ কমিটিতে চাকরির পাশাপাশি তিনি এই পত্রিকায়ও চাকরি নেন। ১৯৬৭ সালে বশীর আল হেলাল বাংলা একাডেমির অনুবাদ বিভাগে সহ-অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। একাডেমির বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন শেষে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ থেকে দীর্ঘ ২৪ বছর চাকরি করার পরে ১৯৯৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারি পরিচালক হিসেবে অবসর নেন। তিনি বাংলা একাডেমি থেকে অবসর নেওয়ার পর বিভিন্ন পত্রিকায় রাজনৈতিক কলাম লেখালেখি শুরু করেন।

বশীর আল হেলাল ১৯৬৮ সালের শুরুর দিকে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় আসার পর ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বশীর আল হেলাল একাধারে কথাসাহিত্যিক, শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক-গবেষক ও অনুবাদক ছিলেন। গ্রামীণ ও শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকে আরও অর্থবহ করতে জীবনধর্মী ও সমাজ সচেতনমূলক অসংখ্য ছোটোগল্প ও উপন্যাস লিখেন তিনি। প্রায় চল্লিশটি প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বাংলা ভাষার ওপরেই তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ছয়টি। তাঁর লেখা গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– *প্রথম কৃষ্ণচূড়া*, *আনারসের হাসি*, *বিপরীত মানুষ*, *ক্ষুধার দেশের রাজা*, *গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড)*, *কাণ্ডারি*। উপন্যাস রয়েছে– *কালো ইলিশ (১৯৭৯)*, *ঘৃতকুমারী (১৯৮৪)*, *শেষ পানপত্র (১৯৮৬)*, *নূরজাহানদের মধুমাস (১৯৮৮)*, *শিশিরের দেশে অভিযান (১৯৯০)*, *জীবনের সুখ (২০০৯)*, যে পথে বুলবুলিরা যায় (২০১৪)। ইতিহাসগ্রন্থ সমূহের মধ্যে রয়েছে– তাঁর আটাশ পৃষ্ঠার *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস (১৯৮৫)* একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ গ্রন্থ। আরও আছে *বাংলা একাডেমির ইতিহাস*, *ভাষা আন্দোলনের সেই মোহনায়*। ভাষা ও সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে– বাংলা ভাষার নানান বিবেচনা (২০০০), আমাদের বিদ্বৎসমাজ, বাংলা গদ্য, আমাদের কবিতা, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ (১৯৯৭), তাঁদের সৃষ্টির পথ। এছাড়া মূল উর্দু থেকে অনুবাদ করেছেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট।

সাহিত্যকর্মে তাঁর অবদানের জন্য তিনি আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৩), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (২০০২), গৌরী ঘোষাল স্মৃতি সম্মান, কলকাতা (২০০২), অধ্যাপক আবুল কাশেম পুরস্কার (২০০৪) ও তমুদ্দুন মজলিস মাতৃভাষা (২০১৫) পদকে ভূষিত হয়েছেন।

বশীর আল হেলালের মরদেহ শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ৩১শে আগস্ট বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আনা হয়। একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার নেতৃত্বে মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন একাডেমির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এসময় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অতিরিক্ত সচিব মনিরুল আলম। এরপর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি ও জানাজা শেষে বাদ মাগরিব মিরপুরের শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপস-এ নবারুণ পড়তে স্মার্ট ফোন থেকে **google play store**-এ **nobarun** লিখে মোবাইল অ্যাপস ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 04, September 2021, Tk. 25.00

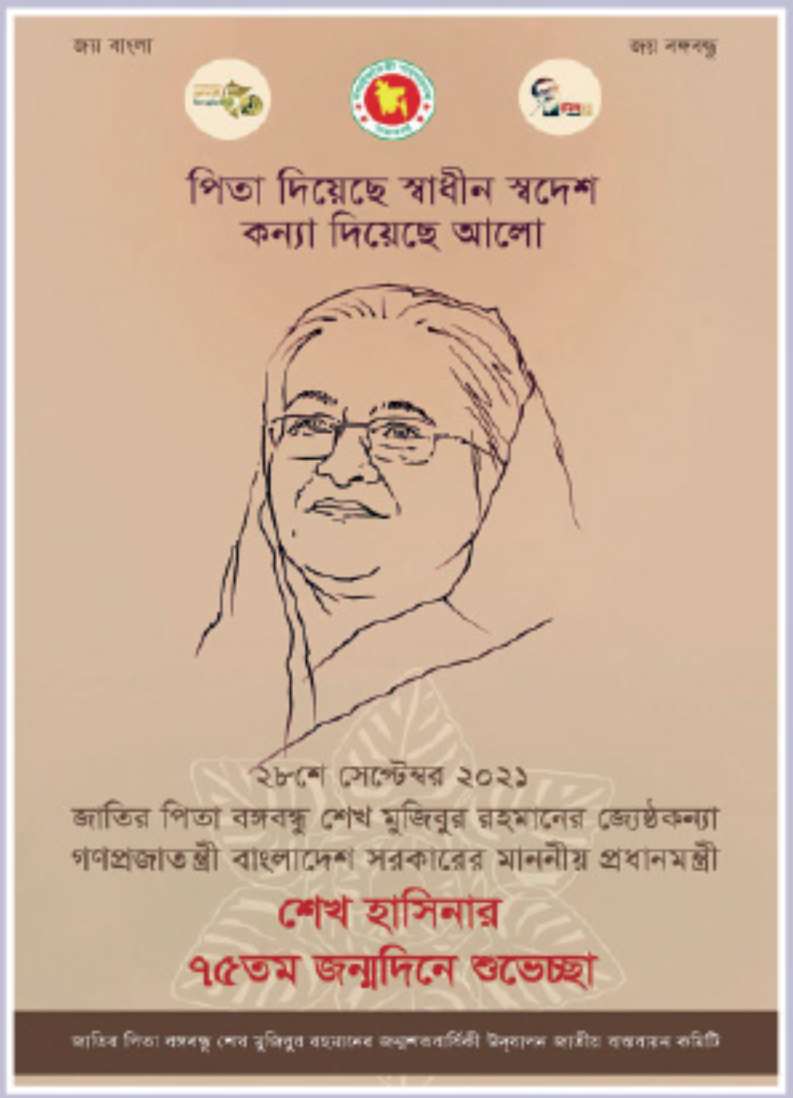

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd